

হুমায়ূন আহমেদ

আকাশের দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়।

অবিকল দেশের মত মেঘ করেছে। চারদিক অন্ধকার করে একটু পরেই যেন কালবৈশাখীর তাণ্ডব শুরু হবে। আনিস কফি খেতে যাচ্ছিল। আকাশ দেখে তার খানিকটা মন খারাপ হয়ে গেল। বড্ড নস্টালজিক মেঘ।

অ্যান্ডারসন ব্যস্ত ভঙ্গিতে পার্কিং লটের দিকে এগুচ্ছিল। আনিসকে দেখে থমকে দাঁড়াল, সরু গলায় বললো, এখনো বাড়ি যাও নি? প্রচণ্ড থান্ডার স্টর্ম হবে। ওয়েদার সার্ভিস স্পেশাল বুলেটিন দিচ্ছে।

কফি খেয়েই রওনা হব।

লিফট চাও? লিফট দিতে পারি।

না লিফট চাই না।

এ অঞ্চলে ঝড় বৃষ্টি বড় একটা হয় না। সে জন্যেই সম্ভবত লোকজনদের ভয় একটু বেশি। দেখতে দেখতে ক্যাম্পাস ফাঁকা হতে শুরু করেছে। কফি হাউসে মোটেই ভিড় নেই। উইক এন্ডে এ রকম থাকে না কখনো। মেয়েরা সেজে-গুজে বসে থাকে। ছেলেরা আসে ডেটের কথা পাকাপাকি করতে।

আনিস কফির পেয়ালা নিয়ে বাঁ দিকে এগিয়ে গেল। কফি হাউসের শেষ মাথায় চার পাঁচটি ছোট ছোট ঘর আছে। তিন নম্বর ঘরটি আনিসের খুব প্রিয়। দারুণ ভিড়ের সময়ও সেটি ফাঁকা থাকে। আজ পুরো কফি হাউস ফাঁকা কিন্তু সেখানে একজন বুড়ি বসে আছে।

আমি কি এখানে বসতে পারি?

বুড়ি সম্ভবত ঘুমুচ্ছিল। আনিসের কথায় নড়েচড়ে বসলো।

নিশ্চয়। নিশ্চয়ই।

বসার পরই আনিসের মনে হল কাজটি ভাল হয় নি। আমেরিকান বুড়িগুলো কথা না বলে থাকতে পারে না। ভ্যাজর ভ্যাজর করে দশ মিনিটের মধ্যে মাথা ধরিয়ে দেয়।

তুমি ইন্ডিয়ান নিশ্চয়ই?

না আমি ইন্ডিয়ান নই।

তুমি কি মালয়েশিয়ান?

না আমি বাংলাদেশী।

সেটি কোথায়?

ইন্ডিয়া ও বার্মার মাঝামাঝি একটা ছোট দেশ।

কত ছোট?

বেশ ছোট। নর্থ ডেকোটার অর্ধেক হবে।

বুড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো আনিসকে। দম ফুরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করবে।

তুমি কি শুনেছো সিভিয়ার থান্ডার স্টর্ম হবে। স্পেশাল বুলেটিন দিচ্ছে দুপুর থেকে।

হ্যাঁ শুনেছি। খুবই খারাপ ওয়েদার।

তুমি কি এই ইউনিভার্সিটির ছাত্র?

না আমি এখানকার একজন টিচার।

কোন সাবজেক্ট ?

কেমিস্ট্রি। পলিমার কেমিস্ট্রি।

আনিস বড়ই বিরক্তি বোধ করতে লাগলো। বুড়িগুলির কৌতূহল সীমাহীন। এরা মানুষদের বড্ড বিরক্ত করতে পারে। বুড়িটি তার ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করলো। লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বললো, তুমি কি এমিলি জোহানের নাম শুনেছ ?

না। কে সে ?

এখানকার একজন বড় কবি। গত বৎসর রাইটার্স গিল্ড এওয়ার্ড পেয়েছে।

না আমি তার নাম শুনিনি। লিটারেচরে আমার তেমন উৎসাহ নেই। বুড়ি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি এমিলি জোহান। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।

আনিস হকচকিয়ে গেল। বুড়ি থেমে থেমে বললো, সমস্ত কফি হাউস ফাঁকা আর তুমি বেছে বেছে আমার এখানে বসতে এসেছ দেখে ভাবলাম হয়তো আমাকে চেন। গল্প করতে চাও। বুড়িদের সঙ্গে ইচ্ছে করে কে আর বসতে চায় বলো ?

আনিস ঠিক কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু একটা বলা উচিত।

তুমি কিন্তু তোমার নাম বল নি এখনো।

আমার নাম আনিস সাবেত। তোমার মত বড় কবির সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো।

বুড়ি গলার স্বর নামিয়ে ফেললো। প্রায় ফিসফিস করে বললো, মোটেই বড় কবি নই। রাইটার্স গিল্ড এওয়ার্ড হচ্ছে একটা সস্তা ধরনের পুরস্কার। এখন পর্যন্ত কোনো বড় কবি রাইটার্স গিল্ড এওয়ার্ড পায় নি। আমি যখন পেলাম তখন এত মন খারাপ হলো যে বলার নয়। বুঝতে পারলাম যে আমি একজন সস্তা ধরনের কবি, থার্ডরেটেড।

বুড়ি উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বললো, তোমার সঙ্গে কি আমার আবার দেখা হবে ?

আনিসের উত্তর দেবার আগেই সে থেমে থেমে বললো,

"ওয়ান ফ্লিউ টু দ্য ইস্ট
ওয়ান ফ্লিউ টু দা ওয়েস্ট
অ্যান্ড ওয়ান ফ্লিউ ওভার দ্য কাক্কুস নেস্ট।"

আনিস অনেকক্ষণ বসে রইল একা একা। এখান থেকে বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে না তবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তা চোখে পড়ে। কত তফাৎ— ঝমঝম শব্দ নেই, গাছের পাতার শন শনানি নেই, ব্যাঙ ডাকছে না। বোঝার কোনোই উপায় নেই যে বাইরে আকাশ অন্ধকার করে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

অ্যাটেনশন প্লিজ। অ্যাটেনশন প্লিজ। কফি হাউজ দশ মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। অ্যাটেনশন প্লিজ।

কফি হাউজ থেকে বেরিয়ে মনে হলো বড্ড বোকামি হয়েছে। অনেক আগেই বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। ভাল ঝড় হচ্ছে। লোকজন কোথাও নেই। পার্কিং লট ধূধূ করছে। আনিস মেমোরিয়াল লাউঞ্জে চলে গেল। মেমোরিয়াল লাউঞ্জে পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা আছে। একটি

প্রকাণ্ড ভিক্টোরিয়ান পিয়ানো আছে। হট চকলেট এবং পেপসির দুটি ভেন্ডিং মেশিন আছে। অবস্থা তেমন খারাপ হলে সেখানকার সোফায় আরাম করে রাত কাটানো যাবে।

লাউঞ্জের শেষ প্রান্তে একটি ছেলে এবং খুবই অল্প বয়সী একটি মেয়ে জড়াজড়ি করে বসেছিল। ছেলেটি এক হাত দিয়ে মেয়েটির জামার হুক খোলবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি বাধা দেয়ার একটি ভঙ্গি করছে এবং খিলখিল করে হাসছে। আনিস না দেখার ভান করে ভেন্ডিং মেশিনের দিকে এগুলো। এই সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলো। এখানে এরকম হয় না কখনো। হাজারো দুর্যোগেও এদের ইলেক্ট্রিসিটি ঠিকই থাকে। মনে হচ্ছে মেয়েটি উঠে আসছে সোফা থেকে।

তোমার কাছে কি সিগারেট আছে ?

আছে।

আমি কি তোমার একটি সিগারেট ধার নিতে পারি ?

আনিস সিগারেট বের করলো। মেয়েটি ফস করে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো। বাদামি রঙের ঢেউ খেলানো চুল মেয়েটির। টানা টানা চোখ। লাইটারের আলোর জন্যেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক আনিসের মনে হলো মেয়েটির মুখ যেন এইমাত্র কেউ তুলি দিয়ে এঁকেছে। সিগারেটের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

ছেলে-মেয়ে দুটি পিয়ানোর আড়ালে চলে গেল। মেয়েটি অনবরত হাসছে খিলখিল করে। হাসির ধরন কেমন অসংলগ্ন। নিশ্চয়ই প্রচুর বিয়ার খেয়েছে। আনিস লম্বা হয়ে সোফায় শুয়ে পড়লো। ইলেকট্রিসিটি এখনো আসছে না। ট্রান্সমিশন লাইন কোথাও পুড়ে-টুড়ে গেছে বোধহয়। মেয়েটির চাপা গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

আহ্ কী অসভ্যতা করছো! হাত সরাও প্লিজ।

আবার খিলখিল হাসি। তারপর দীর্ঘ সময় আর কিছুই শোনা গেল না। বাইরে ঝড়ের বেগ বাড়ছে। ঘনঘন বিজলী চমকাচ্ছে। আনিস শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন ঝড় থেমে গিয়েছে। ইলেকট্রিসিটি এসেছে। মেমোরিয়াল ইউনিয়ন আলোয় ঝলমল করছে। ছেলেটি নেই মেয়েটি টেবিলে পা তুলে বসে আছে একা একা।

তোমার কাছ থেকে কি আমি আরেকটি সিগারেট নিতে পারি ?

আনিস একটি সিগারেট দিল। মেয়েটি সিগারেট ধরিয়ে ক্লান্ত স্বরে বললো, তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে ?

না। কেন বলতো ?

গাড়ি থাকলে তোমাকে একটা লিফটের জন্যে অনুরোধ করতাম।

সরি, গাড়ি নেই আমার।

তুমি থাক কোথায় ?

টুয়েলভ অ্যাভিন্যু।

তোমার সঙ্গে আমি টুয়েলভ অ্যাভিন্যু পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যেতে পারি, কী বল ?

তা পার।

আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

মেয়েটি বাঁ হাতে তার কপাল টিপে ধরলো। আনিস বললো, তোমার ছেলে বন্ধুটি কোথায়?

ও আমার বন্ধু হবে কেন? কোথায় গেছে কে জানে? ওর সঙ্গে বকবক করেই তো আমার মাথা ধরেছে।

বৃষ্টি নেই কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তায় নেমেই মেয়েটি খুব সহজ ভঙ্গিতে আনিসের হাত ধরলো।

তোমার অ্যাপার্টমেন্টে কি টাইলানল আছে?

আছে।

মনে হয় আমার জ্বর আসছে। দুটি টাইলানল এবং গরম কফি খেতে পারলে হত।

আনিস কথা বললো না। মেয়েটির সত্যি সত্যি জ্বর আসছে। হাত বেশ গরম।

আমি কি তোমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে এক কাপ গরম কফি খেতে পারি? রাত বেশি হয় নি তাই জিজ্ঞেস করছি।

হ্যাঁ খেতে পার।

আমাকে আরেকটা সিগারেট দাও।

মাথা ধরা তাতে আরো বাড়বে।

আমি তাতে কেয়ার করি না। আমি কোনো কিছুতেই কেয়ার করি না।

তা ভাল।

ভাল হোক মন্দ হোক আমি কেয়ার করি না।

বাসার সামনে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়ালো। অবাক হয়ে বললো, এত বড় বাড়ি! এটা তোমার?

ভাড়া দিয়ে থাকি। নিজের নয়।

আমি ভেবেছিলাম তুমি স্টুডেন্ট।

না আমি স্টুডেন্ট নই।

আনিস টাইলানল নিয়ে আসলো। পানির বোতল আনলো। মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বললো, আমার জ্বর আসছে। তোমার কাছে থার্মোমিটার আছে?

না থার্মোমিটার নেই।

তোমার গাড়ি থাকলে ভাল হত, আমাকে পৌঁছে দিতে পারতে।

আমি আমার এক বন্ধুকে টেলিফোন করছি। সে তোমাকে পৌঁছে দেবে।

আমি কি তোমার এখানে এক রাত থাকতে পারি? ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।

আনিস চুপ করে রইলো। মেয়েটি থেমে থেমে বললো, কি থাকতে পারি?

তা পার।

আমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দাও। আমার বড্ড খারাপ লাগছে।

শোবার এই ঘরটি চমৎকার করে সাজানো। মেয়েটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো অনেকক্ষণ। তারপর খানিক ইতস্তত করে বললো, তুমিও কি শোবে আমার সঙ্গে ?

না।

আরো শোবার ঘর আছে ?

হ্যাঁ

মেয়েটি পায়ের জুতা খুললো। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা ছিল। স্কার্ফ খুলে মুখ মুছলো তারপর খুব সহজভাবে বললো, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যি তোমার ইচ্ছা হলে আমার সঙ্গে শুতে পার। আমি কিছুই কেয়ার করি না।

নাম কী তোমার ?

মালিশা।

শুভরাত্রি মালিশা।

মালিশা কোনো জবাব দিল না। আনিস ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবলো কাজটা বোধহয় ঠিক হলো না। এইসব 'হোবো' শ্রেণীর মেয়েদের ঘরে থাকতে দিতে নেই। হয়তো একটি প্রস্টিটিউট। শহরের নষ্ট মেয়েদের একজন। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মন খারাপ হয় শুধু।

টিভিতে জনি কার্সন শো হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট কার্টার দাঁত বের করে কী ভাবে হাসে তাই দেখাচ্ছে। আহামরি কোনো অভিনয় নয় এতেই স্টুডিও'র লোকজন হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। চ্যানেল ফোরে লেট নাইট মুভি শুরু হল। অর্থাৎ রাত বেশি হয় নি। একটা এখনো বাজে নি। আনিস কফি বানালো। ঘুমুতে যাওয়ার আগে কফি খাবার এই একটি বিশ্রী অভ্যাস তার আমেরিকা এসে হয়েছে।

মালিশা কি কফি খাবে ? সম্ভবত না। মেয়েটিকে থাকতে দেয়া ভুল হয়েছে।

ড্রাগস ট্রাগস খেয়ে এসেছে কি না কে বলবে ? হয়ত রাত দুপুরে চেঁচামেচি শুরু করবে।

আনিস ঘুমুতে গেল অনেক রাতে। বাতি নেভাবার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে হলো আজ সন্ধ্যায় যে মহিলা কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর নাম মনে পড়ছে না। চমৎকার একটি নাম। খুব সম্ভবত এম দিয়ে শুরু হয়েছে। নামটি মনে না আসা পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসবে না। ছটফট করতে হবে বিছানায়। পুরনো সেই রোগ আবার দেখা দিচ্ছে। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ঘাড়ের পাশের রগদুটি ফুলে উঠছে। কাউকে জিজ্ঞেস করলে হয় না ? সফিক তো অনেক দিন ধরে আছে এইখানে। এত রাত্রে টেলিফোন করাটা কি ঠিক হবে ?

হ্যালো সফিক ? জেগে ছিলে ?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার ?

আচ্ছা শোন, তুমি কি এখানকার কোনো মহিলা কবিকে চেন ? বেশ বয়স ভদ্রমহিলার।

সফিক বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বললো, কী ব্যাপার আনিস ভাই ?

কোনো ব্যাপার না এম্নি জিজ্ঞেস করছি। ভদ্রমহিলার নাম এম দিয়ে শুরু।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী জন্যে?

আনিস লাইন কেটে দিল। সফিক এখন নির্ঘাৎ আবার টেলিফোন করবে। কাজেই এখন প্লাগ থেকে টেলিফোন খুলে রাখা উচিত।

আনিসের সারা রাত ঘুম হলো না। ঘুম আসলো ভোর বেলা।

২

ফার্গো খুবই ছোট শহর।

আমেরিকানরা একে সিটি বলে না বলে টাউন।

সাধারণ একটি সিটিতে যা যা থাকে তার সবই অবশ্যি আছে। আকাশ ছোঁয়া দালানই শুধু নেই। দুটি নাইট ক্লাব আছে। মেয়েরা সেখানে নগ্ন হয়ে নাচে। একটা বড় ক্যাসিনো আছে। সেখানে সপ্তাহে ছয়দিন দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা ব্লাক জ্যাক খেলা হয়। অত্যাধুনিক শপিং মল আছে বেশ কয়েকটি, তবু ফার্গো সিটি নয় টাউন। নিউইয়র্ক বা শিকাগো থেকে যেসব বাঙালি এখানে আসে তারা চোখ কপালে তুলে বলে, আরে এ তো আমাদের কুমিল্লা শহর। ভিড় নেই হৈচৈ নেই। বাহ্ চমৎকার তো!

কিন্তু বেশিদিন কেউ থাকে না এখানে। শীতের সময় প্রচণ্ড শীত পড়ে। কানাডা থেকে উড়ে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া। থার্মোমিটারের পারদ ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নিচে নেমে থমকে দাঁড়ায়। অসহনীয় অকল্পনীয় ঠাণ্ডা। একটা শীত কোনোমতে কাটাবার পরই ফার্গোর মোহ কেটে যায়। ঘরের মধ্যে ছ'মাস বন্দি হয়ে থাকতে পারে কেউ? বাঙালিরা মুখ কুঁচকে বলাবলি করে, এখানে মানুষ থাকতে পারে? এখানে বাস করতে পারে পোলার বিয়ার আর সীল মাছ।

তবু অনেকেই আসে। ঘর বাড়ি কিনে স্থায়ী হয়ে যায় কেউ কেউ। যেমন স্থায়ী হয়েছেন আমিন সাহেব। শহরে বাড়ি করেছেন। মিনেসোটায় পেলিকেন লেকের ধারে সামার হাউস কিনেছেন। বিশ বছর আগে যে দেশ ছেড়ে এসেছিলেন আজ আর তার জন্যে মন কাঁদে না।

অথচ শুরুতে কী দিন গিয়েছে! ইউনিভার্সিটি থেকে সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে ফিরতেন। ঘরে রাহেলা একা। কিছুই করবার নেই। কতক্ষণ আর টিভির সামনে বসে থাকা যায়। একা একা দোকানে ঘুরতে কার ভাল লাগে? আমিন সাহেব সান্ত্বনা দিতেন, আর একটা মাত্র বৎসর। পি.এইচ-ডি করব না। এম.এস. করে ফিরে যাব। আর মাত্র ক'টা দিন কষ্ট কর।

পরিবর্তন হল খুব ধীরে। আমিন সাহেব একদিন অবাক হয়ে লক্ষ করলেন রাহেলা চমৎকার ইংরেজি শিখেছে।

বাহ্ তুমি তো চমৎকার ইংরেজি বল। কোত্থেকে শিখেছ? একেবারে আমেরিকান একসেন্ট। কীভাবে শিখলে?

টিভি দেখে দেখে শিখেছি। কী আর করব বল?

দু'বছরের মাথায় চাকরি হল রাহেলার। আহামরি কিছু নয়। রিসার্চ ল্যাবে সূর্যমুখী ফুলের চারা বাছা। সেই বছর গাড়ি কিনলেন আমিন সাহেব। নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান

মডেল ডজ পোলারা। প্রকাণ্ড গাড়ি। নিজের গাড়িতে করে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন ডেভিলস লেকে। রাহেলার মনে হল সে বোধহয় আগের মত অসুখী নয়।

দেখতে দেখতে কতদিন হয়ে গেল। প্রচুর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে যাওয়া হয়ে উঠলো না। বেড়াতে যাবার জন্যেও নয়। একটা না একটা ঝামেলা থাকেই। পি এইচ-ডি'র বছর দেশে যাওয়া যাবে না। নতুন চাকরি, দেশে যাওয়া যাবে না। ইমিগ্রেশন না হওয়া পর্যন্ত বের হওয়া ঠিক হবে না। নতুন বাড়ি কেনা হয়েছে। এখন বাড়ি ঠিকঠাক করতে হবে, দেশে যাওয়া পিছাতে হবে। প্রথম বাচ্চা হবে এ সময়টা তো আমেরিকাতে থাকতেই হবে।

তারা প্রথম বারের মত যখন দেশে গেল তখন রুনকির বয়স চার বছর। প্রায় এক যুগ পর দেশে ফেরা। কী দারুণ উত্তেজনা গিয়েছে! কিন্তু দেশে ফিরে কিছুই ভাল লাগলো না। নোংরা ঘর বাড়ি। দেয়ালগুলি ময়লা। রাতের বেলা কেমন অন্ধকার অন্ধকার লাগে চারদিক। মানুষজনও কেমন যেন বদলে গেছে। কেউ যেন ঠিক সহজ হতে পারে না। বড় খালা যিনি সারা জীবন তুই তুই করে কথা বলতেন তিনি পর্যন্ত তুমি বলা শুরু করলেন।

এক মাস পরই রুনকি পড়ে গেল অসুখে। যা খায় কিছুই হজম করতে পারে না। রাহেলা আমেরিকা ফিরে এসে হাঁপ ছাড়লো।

দেখতে দেখতে কতদিন হয়ে গেল। বিশ বছর অনেক লম্বা সময়। রাহেলার বাবা মা মারা গেলেন। আমিন সাহেবের বাবা মা'তো আগেই ছিলেন না। কোনো পিছু টান রইলো না। রাহেলার সবচে ছোট বোনটির বিয়ে হয়ে গেল। কোথায় আছে সে কিছুই জানা নেই। জানবার জন্যে সেরকম উৎসাহও এখন হয় না। সবকিছু যেন হারিয়ে গেছে। আজকাল আয়নায় মুখ দেখলে রাহেলার তীক্ষ্ণ ব্যথাবোধ হয়। মুখের চামড়া শ্লথ হয়ে এসেছে। কানের দু'পাশের সাদা চুল সাপের মত কিলবিল করে। এখন তাঁর অন্য এক ধরনের আলস্য বোধ হয়। সকাল বেলা চেয়ার পেতে বারান্দায় একা একা বসে থাকেন। আমিন সাহেব তাঁকে বিরক্ত করেন না। কেমন একটা দূরত্ব এসে গেছে তাঁদের মধ্যে। মাঝে মাঝে রুনকি আসে ঝড়ের মত।

আবার তুমি চেয়ার নিয়ে বসেছ? শিকড় গজিয়ে শেষে তুমি একটা গাছ হয়ে যাবে মা।

আয় তুইও বোস।

হুঁ, আমার যেন কোনো কাজ নেই।

রুনকি দেখতে তাঁর মত হয় নি তবু চমৎকার হয়েছে। গায়ের রঙ চাঁপা। কিন্তু কী কালো শান্ত চোখ! তাকালেই কেমন যেন মন খারাপ হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুনকি যখন চুল ব্রাশ করে তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। রুনকি ঠোঁট বাঁকায়, এমন করে তাকাও কেন মা?

কেমন করে তাকাই?

কেমন যেন পুরুষ পুরুষ চোখে তাকাও।

তিনি তাঁর নিজেরে মেয়েকে একটুও বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে অনেক কায়দা করে জিজ্ঞেস করেন, তুই কী রকম ছেলে বিয়ে করতে চাস রুনকি?

বিয়ের কথা আমি মোটেই ভাবছি না। বছরের পর বছর একটা ছেলের সঙ্গে থাকা বড্ড

আগ্লি।

এসব আবার কী ধরনের কথা ?

সত্যি কথাই বলছি তোমাকে। যেসব ছেলে আমার সঙ্গে ডেট করে তুমি কি ভাবছ আমি ওদের কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবি ? হলি কাউ। তাছাড়া ওরাও বিয়ে করতে চায় না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে নিয়ে শুতে চায়।

রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, তুই নিশ্চয়ই ওদের ঘরে যাস না ?

মা যাই কি না যাই সেসব আমি তোমার সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই না। আমার বয়স ১৯ হয়েছে। তোমাদের কোনো রেসপনসিবিলিটি নেই।

রাহেলা চান একটি হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করবে রুনকি। জীবনে যে সমস্ত সুখ ও আনন্দের কথা তিনি সারাজীবন কল্পনা করেছেন তার মেয়ে সেসব ভোগ করবে। কিন্তু এই দূর দেশে তেমন ছেলে পাওয়া যাবে কোথায় ? রাহেলা লং ডিসটেন্সে পরিচিত সবাইকে একটি ছেলের কথা বলেন। খোঁজ যে আসে না তাও নয়। প্রথমেই জানতে চায় মেয়ের কি ইমিগ্রেশন আছে ? বিয়ে করলে এখানে থেকে যাবার ব্যাপারে কোনো সাহায্য হবে কি ? মেয়ের ছবি দেখতে চায় না, মেয়েটিকে দেখতে চায় না। গ্রীন কার্ড দেখতে চায়।

আমিন সাহেব নিজের ঘরে বসে কী যেন লিখছিলেন। একতলার সর্ব পশ্চিম কোণার ছোট ঘরটি তার নিজস্ব ঘর। ঘরটিতে আসবাব বলতে ছোট একটা লেখার টেবিল, একটা ইজি চেয়ার, বুক শেলফ। বুক শেলফে কয়েকটি রেফারেন্স বই, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কিছু পুরনো সংখ্যা এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতি' ছাড়া অন্য কোনো বই নেই। আমিন সাহেব মাঝে মাঝেই দরজা বন্ধ করে এই ঘরে বসে কী যেন লেখেন। রাহেলার কৌতূহল হলেও কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আমিন সাহেবের কোনো বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে আজ আর তার ভাল লাগে না।

রাহেলা দরজায় দুবার টোকা দিয়ে মৃদু গলায় বললেন, আসব ? জবাব পাবার আগেই তিনি পর্দা সরিয়ে আমিন সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। আমিন সাহেব তাঁর লেখাটি আড়াল করবার চেষ্টা করলেন। রাহেলা ভান করলেন যেন তিনি এসব কিছুই লক্ষ করছেন না।

আমি আজ সন্ধ্যায় কয়েকজনকে খেতে বলেছি। আমিন সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

তুমি টচি থেকে শুটকি মাছ এনে দেবে।

শুটকি মাছ পাওয়া যায় ?

মাঝে মাঝে যায়।

আমি নিয়ে আসব ?

রাহেলার মনে হলো আমিন সাহেব অস্বস্তিবোধ করছেন যেন তিনি চান না রাহেলা এখানে থাকে। কিন্তু এরকম মনে করার কারণ কী ? রাহেলা নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, কী লিখছো ?

তেমন কিছু না।

রাহেলা খানিকক্ষণ সরু চোখে তাকিয়ে থেকে দোতলায় চলে গেলেন। দোতলার একেবারে শেষ কামরাটি রুনকির। সে দরজা বন্ধ করে গান শুনছে।

রুনকি দরজা খুলো তো মা।

রুনকি দরজা খুলে দিল। তার চোখ ভেজা। মনে হলো সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে।

কী হয়েছে রুনকি ?

কিছু না মা। নেইল ডাইমণ্ডের গান শুনছিলাম। ওর গান শুনলে খুব লোনলি ফিলিং হয়।

রুনকি মিষ্টি করে হাসলো। রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমি কয়েকটি ছেলেকে খেতে বলেছি। তুমি সন্ধ্যাবেলা যেয়ো না কোথাও।

ঠিক আছে মা।

তোমার নীল শাড়িটা পরবে।

বেশ। বিশেষ কাউকে আসতে বলেছো ?

রাহেলা ইতস্তত করে বললেন, আনিস নামের একটি ছেলে আসার কথা, এন-ডি-এস-ইউয়ের টিচার। খুব ভাল ছেলে।

কী করে বুঝলে খুব ভাল ছেলে ?

সফিক বলেছে।

রুনকি হাসি হাসি মুখে বললো, নিশ্চয়ই আনমেরিড। এবং নিশ্চয়ই তুমি চাও আমি খুব ভদ্র নম্র ভাবে তার সঙ্গে কথা বলি।

চাওয়াটা কি খুব অন্যায় ?

না অন্যায় হবে কেন ? তবে মাস্টারদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।

রাহেলা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। রুনকি বললো, তোমার চিন্তার কিছুই নেই। আমি খুব ভদ্র ও নম্র ভাবে থাকবো। একটুও ফাজলামি করবো না। দেখবে মিষ্টি মিষ্টি হাসছি শুধু।

৩

আনিসের ঘুম ভাঙ্গলো এগারোটায়।

সে কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না সত্যি সত্যি এগারোটা বাজে ? আজ শুক্রবার সাড়ে ন'টায় একটা ক্লাশ ছিলো। তিনশ ছয় নম্বর কোর্স 'পলিমার রিয়োলজি।' এখন অবশ্যি করার কিছুই নেই। মিস ক্যাথরীনকে টেলিফোন করে দিতে হবে। ক্লাশ মিস করা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। সময় করে নিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু ঘুমের জন্যে ক্লাসে না যেতে পারাটা লজ্জার ব্যাপার।

আনিস টেলিফোন হুক লাগানো মাত্রই টেলিফোন বেজে উঠলো।

হ্যালো আনিস ভাই ? আমি সফিক।

বুঝতে পারছি।

কাল রাত থেকে এই নিয়ে ছয় বার টেলিফোন করেছি। আপনি কি টেলিফোন

ডিসকানেক্ট করে রেখেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আমি ভাবলাম কী ব্যাপার ? এদিকে আপনার মহিলা কবির নাম পেয়েছি। নাম হচ্ছে মেরি স্টুয়ার্ট।

আনিস ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, মেরি স্টুয়ার্ট নয়। ভদ্রমহিলার নাম এমিলি জোহান। রাত্রে মনে করতে পারছিলাম না এখন মনে পড়েছে।

আনিস ভাই আপনার কি শরীর খারাপ ?

না শরীর ঠিক আছে।

আমিন সাহেবের বাসায় যাবার কথা মনে আছে তো ?

আজকে তো নয়, কাল।

হ্যাঁ কাল। শুনুন আনিস ভাই, আমি আসছি।

এখন ?

এই দশ মিনিটের মধ্যে। সিরিয়াস কথা আছে।

আনিস টেলিফোন রেখে চায়ের পানি বসিয়ে দিল। পানি গরম হতে হতে হাত মুখ ধুয়ে আসা যাবে। হাত মুখ ধুতে গিয়ে মনে পড়লো আরেকটি প্রাণী আছে। আশ্চর্য এত বড় একটা ব্যাপার এতক্ষণ মনে পড়লো না কেন ?

কিন্তু মালিশা ছিল না। ঘরের বিছানা সুন্দর করে পাতা। বিছানার উপর এক টুকরো সাদা কাগজ পড়ে আছে। আনিস দেখলো সেখানে পেন্সিলে লেখা— তুমি ঘুমাচ্ছ দেখে জাগালাম না। অনেক ধন্যবাদ।

আনিসের কেন যেন একটু মন খারাপ লাগলো। অথচ মন খারাপ হবার কোনো কারণ নেই। আজকের দিনটি খুবই খারাপ যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এরকম খারাপ দিন আসে। কোনো কিছুই ঠিক মতো হয় না।

সফিকের দশ মিনিটের মধ্যে আসার কথা। সে দু'ঘণ্টার মধ্যেও আসলো না। মিস ক্যাথরীনকেও টেলিফোন করে পাওয়া গেল না। ইউনিভার্সিটিতে এখন গিয়ে হাজির হওয়ার কোনো মানে হয় না। আনিসের মনে হল তার জ্বর আসছে। কী ভয়ঙ্কর খারাপ দিন। টিভি-র নিউজ চ্যানেলে পর্যন্ত একটিও ভাল খবর নেই।

ক্যান্টাকিতে দুটি শিশুকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

সল্ট টু ট্রিটির আলোচনা ভেস্তে গেছে।

বেলজিয়ামের লিয়েগে শহরে একটি ট্রেন নদীতে পড়ে দেড়শ লোকের সলিল সমাধি হয়েছে।

বাগানে চেয়ার সাজানো হয়েছে।

রুনকির মনে হল তার মা কিছুটা বাড়াবাড়ি করছে। দু'বার টেবিল ক্লথ পাল্টানো হয়েছে। ফুলদানিতে ফুল সাজানো হয়েছে। স্টেরিও সিস্টেমকে টেনে আনা হয়েছে বাইরে।

রুনকি বললো, মা তুমি বড্ড হুলুস্থুল করছো।

রাহেলা অসন্তুষ্ট হলেন। তার কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাজ পড়লো, বাইরে চেয়ার পেতে বসলে বুঝি হুলুস্থুল হয়?

তা হয় না কিন্তু ফুলদানি রাখলে হুলুস্থুল হয়। তুমি ছয় ডলার খরচ করে ফুল আনিয়েছ মা।

বেশ তো তোমার অপছন্দ হলে ফুলদানি তুলে নাও।

রুনকি অপ্রস্তুত হলো। তার মা স্পষ্টই রেগে গেছেন। সে তার মাকে ঠিক বুঝতে পারে না। অত্যন্ত ছোট কারণে তিনি অসম্ভব রেগে যেতে পারেন। রুনকি হাসি হাসি মুখে বললো, মা তুমি যদি চাও তাহলে আমি নীল শাড়িটা পরব।

আমার আবার চাওয়া চাওয়ি কী রুনকি? আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাই নি।

রুনকি মুখ কালো করে তার ঘরে চলে গেল। এমন একটি চমৎকার দিন কেমন করেই না নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রুনকি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। এই ঘরে নিজের মনে কাঁদা যায়। উঁচু ভ্যলুমে গান বাজানো যায়। এটি তার নিজের গোপন পৃথিবী।

টুকটুক করে টোকা পড়ছে দরজায়। নিশ্চয়ই বাবা। এমন শালীন ভঙ্গিতে বাবা ছাড়া আর কেউ দরজা নক করতে পারেন না। রুনকি নরম গলায় বললো, কী চাও বাবা?

দরজা খুলো বেটি। তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।

কী সারপ্রাইজ?

খুলেই দেখ।

রুনকি বেরিয়ে এলো, তার দু'চোখ ভেজা। চুল এলোমেলো। তোমার জন্যে একটি গিফট প্যাকেট এসেছে। ইতালি থেকে। ইতালিতে কে আছে তোমার মা?

টম। সামার কাটাতে গিয়েছে।

রুনকি প্যাকেট খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্লাস্টার অব প্যারিসের তৈরি অপূর্ব একটি নারী মূর্তি। নিশ্চয়ই মাইকেল এঞ্জেলোর কোনো ভাস্কর্যের ইমিটেশন। রুনকি গাঢ় স্বরে বললো, কী সুন্দর দেখেছ?

হ্যাঁ সুন্দর। খুবই সুন্দর।

মাকে দেখিয়ে আনি।

রুনকি ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাহেলা রান্না ঘরে। রান্না বান্নার কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। খাবার দাবার গরম রাখার জন্যে শুধু ওভেনে দিয়ে রাখা। অনেক রকম আয়োজন হয়েছে তবু রাহেলার মনে হচ্ছে আয়োজন পূর্ণাঙ্গ হয় নি। কাঁচামরিচ নেই ঘরে হর্নবাকারসে কাঁচামরিচ পাওয়া যায় নি। তিনি বা আমিন সাহেব কেউ অবশ্যি ঝাল খান না তবে প্রবাসী বাঙালিরা খাবার টেবিলে কাঁচামরিচ দেখতে ভালোবাসে।

মা দেখ টম কী পাঠিয়েছে।

কোন টম? পাগলা টম?

রুনকি বেশ বিরক্ত হল। টম আবার কয়জন আছে যে পাগলা টম বলতে হবে? রুনকি বললো, মূর্তিটি আমি বাগানে সাজিয়ে রাখি মা? তোমার অতিথিরা দেখলে অবাক হবে।

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, না রুনকি, এটি তোমার ঘরেই থাক। মূর্তিটি অশালীন।

রুনকি স্তম্ভিত হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঝড়ো বেগে দোতলায় উঠে গেল।

অতিথিদের মধ্যে প্রথম আসলেন নিশানাথ রায়। গ্রান্ড ফোকস ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর। ভদ্রলোকের বয়স ৫৫ কিন্তু দেখায় ৭০ এর মত। লম্বা দড়ি পাকানো চেহারা। যে কোনো নিমন্ত্রণে সবার আগে এসে উপস্থিত হন এবং নিরিবিলি একটি কোণ বেছে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন কিংবা ঘুমান। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতেও ক্লাস নিতে গিয়ে একই কাণ্ড। তবু তিনি টিকে আছে কারণ 'টপলজি'তে একজন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁকে এখনো ধরা হয় (যদিও টপলজি তিনি ছেড়েছেন দশ বছর আগে)। অনেকের ধারণা গ্রান্ড ফোকস ইউনির্ভার্সিটির নাম লোকে জানে কারণ প্রফেসর নিশানাথ এখানে মাস্টারি করেন।

নিশানাথ বাবু তাঁর স্বভাব মত পাঁচটার দিকেই এসে পড়লেন এবং লজ্জিত স্বরে বললেন, দেরি করে ফেললাম নাকি ?

আমিন সাহেব হাসি মুখে বললেন, না দেরি হয় নি। চা দেব, না লিকার ?

নিশানাথ বাবু বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। পরিষ্কার বোঝা গেল না। তিনি বেছে বেছে সবচে' পেছনের একটি চেয়ারে পা উঠিয়ে বসলেন। আমিন সাহেব মার্টিনির একটি বড় গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন নিশানাথ বাবু চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন।

নিশানাথ বাবু নিন, মার্টিনি এনেছি।

ইয়ে কী যেন বলে আমি অবশ্যি চা চেয়েছিলাম।

চা নিয়ে আসতে পারি পানি গরম আছে।

নিশানাথ বাবু তার উত্তর দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন।

রাত আটটা বেজে গেল। অন্য দুজন নিমন্ত্রিতের কোনো খোঁজ নেই। সফিকের ঘরে টেলিফোন করা হল কয়েকবার কেউ ধরলো না। রুনকি বললো, নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হয়েছে মা। তুমি এমন মুখ কালো করে থেকো না।

কী আজেবাজে কথা বল রুনকি ? মুখ কালো করব কেন ?

আমি সরি মা।

ঠিক আছে খেতে বস।

নিশানাথ বাবু নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন। আমিন সাহেব একবার বললেন, রান্না কেমন হয়েছে নিশানাথ বাবু ?

নিশানাথ বাবু তার জবাব দিলেন না। তিনি কখনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব দেন না। রুনকি বললো, নিশা চাচার জিহ্বায় কোন টেস্টবাড নেই। তিনি যাই খান তাই তাঁর কাছে ঘাসের মত লাগে। তাই না চাচা ?

নিশানাথ বাবু তার উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তখন টেলিফোন বাজলো। টেলিফোন ধরলো রাহেলা।

হ্যালো আমি সফিক।

রাহেলা শুকনো গলায় বললেন, আমরা সবাই খেতে বসেছি, একটু পরে ফোন করতে পার ?

রাহেলা কঠিন মুখ করে খেতে বসলেন। রুনকি মায়ের দিকে না তকিয়ে বললো, মা এটা কিন্তু তুমি ঠিক করলে না।

রাহেলা উত্তর দিলেন না। নিশানাথ বাবু বললেন, প্রচুর আয়োজন করেছেন। মনেই হয় না বিদেশ। রুনকি বললো, মা ওদের হয়তো বিশেষ কোনো ঝামেলা হয়েছে। টেলিফোন নামিয়ে না রেখে তোমার উচিত ছিল...

আমার কী উচিত অনুচিত তা আমি তোমার কাছ থেকে শিখতে চাই না। তুমি ভাজা মাছ আরো নেবে ?

না।

নিশানাথ বাবু আপনি নেবেন ?

না।

নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে বললেন, এটা ভাজা মাছ ? আমি ভাবছিলাম...।

রুনকি বললো, তুমি শুধু শুধু রাগ করছ মা। ওদের নিশ্চয়ই বড় রকমের কোন ঝামেলা হয়েছে।

নিশানাথ বাবু বললেন, কাদের ঝামেলা হয়েছে ?

যাদের আসবার কথা ছিল তাদের।

কী ঝামেলা ?

সেটা এখনো জানা যাচ্ছে না। হয়তো ভদ্রলোক বাথরুমে গিয়ে দেখেন বাথটাবে একটি ডেডবডি পড়ে আছে। ডেড বডিটির পিঠে একটি ওরিয়েন্টাল কাজ করা ছুরি।

আমিন সাহেব হেসে ফেললেন।

হাসির কী হল বাবা ? হতেও তো পারে।

নিশানাথ বাবু বললেন, এদেশে সবই সম্ভব। খুন-খারাবি এদের কাছে কিছুই না, অতি অসভ্য বর্বরের দেশ।

ঝামেলাটা কী হয়েছে তা জানা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে আটকা পড়েছে। সফিকের প্রাচীন ফোর্ড ফিয়াসটার ট্রান্সমিশন কাজ করছে না। হাইওয়ের একটি রেস্ট হাউসে বসে আছে দু'জন। রুনকি বললো, রাস্তার মাঝখানে গাড়ি নিয়ে আটকা পড়া দারুণ এক্সাইটিং। রাহেলা ভ্রূ কুঁচকালেন। ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, এর মধ্যে এক্সাইটিং কী দেখলে তুমি ? সাধারণ মানুষদের মত ভাবতে শেখ। গাড়ি নিয়ে আটকা পড়াটা হচ্ছে যন্ত্রণা। এক্সাইটমেন্ট নয়।

তুমি এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন মা ?

রুনকি কথা বন্ধ করে গাড়ি নিয়ে ওদের খোঁজে যাও। তোমার বাবাকে পাঠাব না। সন্ধ্যা থেকে মার্টিনি খাচ্ছে, ওর হাত স্টেডি নেই।

কথাটা ঠিক না। দুপেগের মত মার্টিনি আমিন খেয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। রাহেলার মেজাজ চড়ে আছে। চুপ করে থাকাই ভাল। নিশানাথ বাবু বসার ঘরের সোফায় পা গুটিয়ে আবার ধ্যানস্থ হয়েছেন। আমিন তার পাশে এসে বসতেই তিনি বললেন— বুঝলেন, অতি অসভ্য অতি বর্বর জাত।

রাহেলা রুনকির সাথে গ্যারেজ পর্যন্ত গেলেন। রুনকির হাতে চাবি দিয়ে বললেন,

নতুন ছেলেটির সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করবে। রুনকি অবাক হয়ে বললো, আমি অভদ্র মা ? কী বলছ তুমি ?

যা বলছি মন দিয়ে শোন। আমি চাই তুমি বাঙালি ছেলেদের সঙ্গে কিছুটা মেলামেশা কর।

রুনকি চুপ করে রইলো। রাহেলা বললেন, তোমার একটি ভাল বিয়ে হোক সেটাই আমি চাই। আমি তোমাকে হ্যাপী দেখতে চাই।

বাঙালি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেই আমি হ্যাপী হব ?তোমার তো বাঙালি ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। তুমি কি হ্যাপী ?

রাহেলা উত্তর দিলেন না। রুনকি বললো, এইসব নিয়ে আমি এখন ভাবতে চাই না। আর আমি চাই না তুমিও ভাব। ইদানীং আমাকে নিয়ে তুমি বেশি চিন্তা করছ।

তুমি বলতে চাও চিন্তার কিছু নেই।

রুনকি গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। রাহেলা বললেন, শাড়ি একটু উপরের দিকে টেনে নাও। এক্সিলেটরের সঙ্গে যেন না লেগে যায়।

হাইওয়েতে নেমেই রুনকি গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে সত্তুরে নিয়ে এল। গ্র্যাণ্ড ফোকস থেকে ফার্গো ইন্টারস্টেট হাইওয়ে ফাঁকা থাকে বলেই পুলিশটুলিস তেমন থাকে না। যত ইচ্ছা স্পীড তোলা যায় গাড়িতে। রুনকির বান্ধবী শ্যারণ একবার পঁচানব্বই পর্যন্ত তুলেছিল। কী প্রচণ্ড কাঁপুনি গাড়ির! রুনকির এতটা সাহস নেই। সত্তুরেই তার খানিকটা হাত কাঁপে। তা ছাড়া 'ফল সিজন' বলেই গাছের পাতা ঝরছে। শুকনো পাতার উপর দিয়ে গাড়ি গেলেই অদ্ভুত শব্দ হয়, কেমন যেন ভয় ভয় করে।

আপনাদের নিতে এসেছি আমি।

আনিস মেয়েটিকে দেখে অবাক হলো। হালকা পাতলা গড়নের বাচ্চা একটি মেয়ে। শিশুদের চোখের মত তরল চোখ। কেমন যেন অভিমানী পাতলা ঠোঁট।

আপনি বুঝি সেই টিচার ? আনিস ? আনিসের উত্তর দেয়ার আগেই মেয়েটি বললো, আমি কিন্তু মাস্টারদের একটুও পছন্দ করি না। আপনি আবার রাগ করবেন না যেন।

আনিস হাসি মুখে বললো, না আমি রাগ করবো না।

মাস্টাররা ক্লাসের বাইরে কিছু জানে না, জানতে চায়ও না।

তাই কি ?

হ্যাঁ। আমি দশ ডলার বাজি রাখতে পারি আপনি কবি কিটসের প্রণয়িনীর নাম জানেন না।

আনিস অবাক হলো। মেয়েটির মুখ হাসি হাসি কিন্তু ঝগড়া বাঁধানোর একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা আছে। সফিক তার গাড়ি নিয়ে এখনো ব্যস্ত। তার ধারণা ঝামেলাটা আসলে ট্রান্সমিশনে নয় কারবুরেটরে, আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই সে ঠিক করে ফেলতে পারবে।

আনিস একটি সিগারেট ধরিয়ে মৃদু স্বরে বললো, কবি কিটসের প্রণয়িনীর নাম জানা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় নয়।

আইনস্টাইনের কয় স্ত্রী সেটা জানা বোধহয় অত্যাবশ্যকীয় ?

না তা নয়। এইসব হচ্ছে বিলাস।

সফিকের গাড়ি একটি ছোট গর্জন করে আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে হাসি মুখে বললো, দেখলেন তো আনিস ভাই প্রায় কায়দা করে ফেলেছি। আর দশ মিনিট।

আনিস সে কথার জবাব দিল না। রুনকি মাথার স্কার্ফ শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে মৃদু স্বরে বললো, আমি তর্ক করে আপনাকে রাগিয়ে দিতে চাই না। তাহলে মা খুব রাগ করবেন। মাকে আমি রাগাতে চাই না। তাঁর কিছুদিন আগেই নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছিল। আরেকবার হলে খুব মুশকিল হবে।

সফিকের গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। বিকট শব্দ আসছে সেখান থেকে।

সফিক কোমরে হাত দিয়ে গাড়িকে উদ্দেশ করে ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেললো— শালা তুমি মানুষ চেন নাই। কত ধানে কত চাল বুঝ নাই। শালা এক চড় দিয়ে তোমার দাঁত খুলে ফেলবো...।

রুনকি খিলখিল করে হেসে ফেললো।

৪

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের একটি ক্লাস ছিল সাড়ে দশটায়। আনিস ক্লাসে ঢুকে দেখলো চেয়ারম্যান ডঃ হিল্ডারবেন্ট পেছনের দিকে বসে আছে। হিল্ডারবেন্ট একা নয় অরগেনিক কেমিস্ট্রির ডঃ বায়ারও কফির পেয়ালা হাতে বসে আছেন। হিল্ডারবেন্ট বললো, আমরা তোমার ক্লাসে বসতে পারি তো ?

আনিস বললো, নিশ্চয়ই।

কোনো প্রশ্ন টশ্ন আবার জিজ্ঞেস করো না হা হা হা। আনিস অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ করে তার ক্লাসে এসে বসার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে এরা তাকে পছন্দ করছে না এটুকু পরিষ্কার বোঝা যায়। পছন্দ না হবার কারণ তার জানা নেই। কোনো কারণ থাকার কথাও নয়।

আনিস বক্তৃতা শুরু করল। ডঃ বায়ার কিছু শুনেছে বলে মনে হলো না। কিন্তু গলায় ফিসফিস করে কী যেন বলছে হিল্ডারবেন্টকে। একবার দুজনেই সশব্দে হেসে উঠলো। হিল্ডারবেন্ট আনিসের দিকে তাকিয়ে বললো, সরি আনিস। তুমি চালিয়ে যাও। আনিস যেতে পারলো না। ডঃ বায়ার হঠাৎ করে বললেন, তোমার ইংরেজি কথা আমি ঠিক ধরতে পারছি না আনিস। তুমি কি আরেকটু স্লো যাবে ?

তুমি তো নিজেই কথা বলছো বায়ার। আমি নিজে স্লো বললেও কিছু আসবে যাবে না।

দু'একটি ছেলে হেসে উঠল। হিল্ডারবেন্ট বললো, চালিয়ে যাও। তুমি চালিয়ে যাও।

আনিস দশ মিনিট আগে ক্লাস শেষ করে দিল। হিল্ডারবেন্ট উঠতে যাচ্ছিল, আনিস বললো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে হিল্ডারবেন্ট।

বল।

আজকে হঠাৎ আমার ক্লাসে এসে বসলে কেন ? পলিমার রিওলজিতে তোমার কোনো উৎসাহ আছে বলে তো শুনি নি।

হিল্ডারবেন্ট খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আমরা বসেছি একটা জিনিস দেখতে। তোমার সম্পর্কে ডীনের অফিসে একটা রিপোর্ট হয়েছে। বলা হয়েছে তোমার উচ্চারণ কেউ বুঝতে পারছে না। রিপোর্ট কি ছাত্ররা করেছে ?

তা জানি না। তুমি ডীনকে জিজ্ঞেস করতে পার। আমি অবশ্যি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তোমার কথা বুঝতে পারার কোনো কারণ নেই।

ধন্যবাদ।

আনিস কফি খেতে গেল মেমোরিয়াল ইউনিয়নে। ডঃ এন্ডারসন খাতাপত্র নিয়ে একটি টেবিল দখল করে বসেছিল। আনিসকে দেখেই গম্ভীর মুখে বললো, তোমাদের বাংলাদেশের স্টল দেখে আসলাম।

কী দেখে আসলে ?

লাইব্রেরিতে আন্তর্জাতিক একটা মেলা হচ্ছে। সেখানে তোমাদেরও একটা স্টল দেখলাম।

আনিসের মনে হল ডঃ এন্ডারসন যেন হাসি গোপন করবার চেষ্টা করলো।

তুমি কফি শেষ করেই যাও।

স্টলের ব্যাপারটি মিথ্যা নয়।

একটি প্রকাণ্ড টেবিল নিয়ে সফিক বসে আছে। সফিকের গায়ে একটি হাতা কাটা স্যান্ডো গেঞ্জি এবং পরনে সবুজ রঙের একটি লুঙ্গি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পোশাক। টেবিলে একটি ময়লা পাঁচ টাকার নোট, দুটি দশ পয়সা। আরেক পাশে একটি বড় ফুলস্কেপ কাগজে মার্কার দিয়ে অ আ লেখা, আনিস স্তম্ভিত।

ব্যাপার কী সফিক ?

আরে আনিস ভাই আজকে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরির খোঁজে এসেছিলাম। শুনি ইন্টারন্যাশনাল উইক হচ্ছে, বাংলাদেশের একটা কিছু না থাকলে দেশের বেজ্জতি। আমার নিজের কাছে যা ছিল নিয়ে চলে এসেছি।

বল কী ?

জিনিস কম থাকায় সুবিধা হয়েছে। দেশটা কোথায় কী এইসব সবাই জানতে চাচ্ছে। হা হা হা। নামটা তো জানলো কী বলেন ?

খালি টেবিল নিয়ে সাতদিন বসে থাকবে বুঝি ?

আরে না। আজ বিকালেই রুনকিদের বাড়ি থেকে এক গাদা জিনিসপত্র নিয়ে আসব দেখবেন। হুলুস্থুল কারবার করব। এক মালয়েশিয়ান আমার স্টলের সামনে এসে দাঁত বের করে হাসছিলো। শালার অবস্থাটা কী হয় কালকে দেখবেন। রুনকিকে নিয়ে আসব। দেশের ইজ্জতের একটা ব্যাপার। আনিস হাসি মুখে বললো, তোমার চাকরির কী ব্যবস্থা হবে ? এই সাতদিন আর যাচ্ছ না সেখানে ?

আরে ভাই রাখেন চাকরি। মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা এখন।

লোকজন কেউ কেউ এসে দাঁড়াচ্ছেও স্টলের সামনে। কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বলছে,

কোন দেশের স্টল এটি ?

বাংলাদেশের।

কোথায় সেটি ? প্যাসিফিক আইল্যান্ড ?

না এশিয়া মহাদেশে।

কত বড় দেশ সেটি ? কত স্কয়ার মাইল ?

কালকে বলতে পারব। কাল আসবেন।

লোক সংখ্যা কত ?

আগামীকাল জানতে পারবেন। সব লিখে টাঙ্গিয়ে দেয়া হবে।

আনিস দূর থেকে দেখলো লোকজন আসছে না সফিকের স্টলে। তবে বুড়ো বুড়িরা কিছু কিছু আসছে। তারা আবার দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সফিকের বক্তৃতা শুনছে।

দেশটা অত্যন্ত সুন্দর। সবুজ গাঢ় সবুজ। সমুদ্র আর নদী। বনে ঘুরে বেড়ায় ইয়া ইয়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আগামী কাল যদি আসেন তবে সেই রয়েল বেঙ্গলের ছবিও দেখতে পাবেন। দয়া করে আসবেন। ভুলবেন না।

৫

সফিকের কাণ্ড কারখানাই অন্যরকম।

পাঁচটা ডলার পকেটে নিয়ে ফার্গোতে এসে এক মাসের মধ্যে দু'শ চল্লিশ ডলার দিয়ে গাড়ি কিনে ফেললো। আমিন সাহেব খবর পেয়ে বিরক্ত হলেন খুব, গাড়ি কিনলে গাড়ির দরকারটা কী তোমার ?

সফিক মাথা চুলকে বলছে, দেশের সম্মানের জন্যেই কাজটা করলাম।

দেশের সম্মান ? দেশের সম্মান মানে ?

গরিব দেশ গরিব দেশ করে তো, বুঝলেন না শালাদের দেখিয়ে দিলাম আর কী ?

তোমার দু'শ চল্লিশ ডলারের গাড়ি দিয়ে ওদের দেখিয়ে দিলে ? চালাতে জান গাড়ি ?

শিখব।

এখানেই শেষ নয়, আর্টসের ছাত্র কীভাবে সায়েন্সের কম্বিনেশনে চার পাঁচটা সাবজেক্ট নিয়ে ফেললো। আমেরিকায় এসে ইতিহাস ভূগোল পড়ে লাভটা কী ? পড়তে হলে পড়তে হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কম্প্যুটার সায়েন্স।

মিড টার্মের রেজাল্ট হওয়ার পর ফরেন স্টুডেন্ট এডভাইজার টয়লা ক্লিন ডেকে পাঠালেন সফিককে। রেজাল্ট ভয়াবহ তিনটি ডি এবং একটি সি।

সফিক তোমার দেশ কোথায় ?

সফিক গম্ভীর হয়ে বললো, ইণ্ডিয়া ম্যাডাম। ক্যালকাটা সিটি।

টয়লা ক্লিন কাগজপত্র ঘেঁটে সফিকের চেয়েও গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু আমার কাছে যেসব কাগজপত্র আছে সেখানে লেখা বাংলাদেশ।

সফিক মাথা চুলকায় জবাব দেয় না।

তুমি কি দয়া করে ব্যাপারটা আমার কাছে এক্সপ্লেইন করবে ?

রেজাল্ট যা হয়েছে ম্যাডাম এতে দেশের একটা বদনাম হয়ে যায় এই জন্যেই বলি ইণ্ডিয়া।

টয়লা ক্লিনের গাম্ভীর্য মনে হয় খসে পড়ছে। ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি।

তোমার দেশের সব ছাত্র বুঝি 'এ' পায় ?

ম্যাডাম আমার দেশের ছাত্ররা সব বাঘের বাচ্চা। যে কোনো আমেরিকান স্ট্রেইট 'এ' ছেলেমেয়েদের এরা কুৎ করে পানি দিয়ে গিলে ফেলবে।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অর্থাৎ এরা খুব মারাত্মক। একেবারে গ্রীন পেপার।

টয়লা ক্লিন বলে দিলেন ফাইন্যালে যে করেই হোক এভারেজ সি থাকতেই হবে। জিপিএ ২এর কম হলে ভিসা রিনিউ হবে না। দেশে ফিরে যেতে হবে।

বাইরে দিনে ছয় সাত ঘন্টা কাজ করে পড়ারই সময় পাই না ম্যাডাম।

কোথায় কাজ কর তুমি ?

নিক্স প্লেসে। বিয়ার বিক্রি হয় সেখানে।

চারদিন পর সফিকের কাছে টয়লা ক্লিনের এক চিঠি এসে হাজির। প্রতি ঘন্টায় মিনিমাম ওয়েজ তিন ডলার পঞ্চাশ সেন্ট করে তোমাকে লাইব্রেরিতে একটি কাজ দেয়া হল। এখন পড়াশোনার ভাল সুযোগ পাবে।

লাভ কিছু হলো না। ফাইন্যালে দেখা গেল চারটাই ডি। টয়লা ক্লিন ভ্রূ কুঁচকে বললো, এখন কী করবে ?

গভীর সমুদ্র ম্যাডাম। বিষ খাওয়া ছাড়া উপায় নাই কিছু।

আরেকটা কোয়ার্টারের সুযোগ যাতে দেয় এই চেষ্টা করব ? প্রথম দিকে কিছু সহজ কোর্স নিলে কেমন হয় ?

সফিককে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের সুযোগ দেয়া হল। ডীনের অফিস থেকে পার্মিশনের জন্যে টয়লা ক্লিনকে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করতে হলো। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে হলো দুটি ডি এবং একটি সি ও একটি এফ। টয়লা ক্লিন গম্ভীর হয়ে বললো, এই ইউনিভার্সিটিতে তুমি আর পড়তে পারছ না সফিক। কী করবে এখন ? দেশে ফিরে যাবে ?

না।

ইল্লিগেল এ্যালিয়েন হিসাবে থাকবে ?

হ্যাঁ।

টয়লা ক্লিন শান্ত স্বরে বললো, গুড লাক। আমেরিকা হচ্ছে ল্যান্ড অব অপরচুনিটি। কিছু একটা হয়েও যেতে পারে তোমার।

সফিক গ্রেভার ইনের কাছে একটা ঘর ভাড়া করে নিক্স প্লেসের কাজে লেগে গেল।

নিক্স প্লেস যে মহিলাটি চালায় তার নাম জোসেফাইন নিক্স। লম্বায় চার ফুট তিন ইঞ্চি। দৈর্ঘ্যের স্বল্পতা সে অবশ্যি পুষিয়ে নিয়েছে ওজন দিয়ে। বর্তমান ওজন ২৩০ পাউন্ড। সে ওজনও প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে। গায়ের রঙ ঘন কৃষ্ণ বর্ণ। গত ছয় পুরুষ ধরে আমেরিকায়

বাস করেও আফ্রিকার আদিম বর্ণের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। সফিককে চাকরি দেবার সময় সে ঘড়ঘড়ে গলায় বললো, তোমাকে চাকরি দিচ্ছি একটি মাত্র কারণে তোমার গায়ের রং কালো। সাদা মানুষগুলিকে ঈশ্বর বিষ্টা দিয়ে তৈরি করেছেন। সাদা মানুষের রক্তের মধ্যে একটা জিনিসই আছে সেটা কী জান?

না।

বিষ। আসল হেমলক বিষ। পৃথিবীতে যত অন্যায় অবিচার হয়েছে সব করেছে সাদা মানুষ।

তাই কি?

একদম খাঁটি কথা। আমার এখানে সাদা মানুষ ঢুকলে পাছায় লাথি দিয়ে বের করে দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা দেয়া যায় না। কারণ ফেডারেল আইনে সাদা এবং কালোর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। কী কুৎসিত আইন। সাদা কখনো কালোর সমান হয়?

জোসেফাইনের এখানে একটি সাদা ছেলেও কাজ করে। কিন্তু তাতে জোসেফাইনের কিছুই যায় আসে না। চক্ষু লজ্জাটজ্জা বলে তার কাছে কিছু নেই।

সাদা মানুষদের মুণ্ডুপাত না করে সে তার দিন শুরু করে না।

হ্যারি (জোসেফাইনের স্বামী) যে আজ জেলে খাবি খাচ্ছে সে কীসের জন্যে?কী কারণে? একটি মাত্র কারণ জজ সাহেব ছিল সাদা। জুরিরা ছিল সাদা। যে পুলিশ ধরেছে সেও ছিল সাদা। এই অবস্থায় হ্যারির বিশ বছরের জেল হবে না তো কার হবে? ইলেকট্রিক চেয়ারে নিয়ে যে বসায় নি সে আমার উপর মাদার মেরীর অসীম করুণা আছে বলেই।

হ্যারির অভাবে জোসেফাইন যে খুব কাতর সে রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই। দিনের মধ্যে দুএকবার সে বলবেই যীশু খ্রিস্টের দয়া হ্যারি এখন জেলে। বাইরে থাকলে নিক্স প্লেসের অর্ধেক বিয়ার সে-ই খেয়ে ফেলতো। এখন ভাল হয়েছে। জেলে বসে আঙ্গুল চুষছে।

কাস্টমারদের সঙ্গে নিত্যদিন খিটিমিটি লেগে আছে। কেউ হয়তো বললো,

ব্লাডি মেরীতে জল মনে হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে জোসেফাইন।

বেশি হলে খেয়ো না তোমাকে পায়ে ধরে সাধছি?

পয়সা দিচ্ছি ঠিক জিনিস খাবো। পানি মেশানো ব্লাডি মেরী খাব কেন?

আলবত খাবে। তুমি একা নও তোমার চৌদ্দগুষ্টি খাবে।

টাকা পয়সা নিয়েও সফিকের সঙ্গে তার খিটমিটি লেগেই আছে। ঘণ্টায় দু'ডলারের বেশি কিছুতেই দেবে না। পোষালে কাজ কর না পোষালে করবে না। দশ ঘণ্টা কাজ করলে সে হিসাব করে বের করে সাত ঘণ্টা কাজ হয়েছে। তার বড় মেয়ে এ্যালেনকে নিয়েও তার আদিখ্যাতার অন্ত নেই। সুযোগ পেলেই গলা নিচু করে বলবে,

খবরদার কোনো রকম ফষ্টিনিষ্টির চেষ্টা করবে না। আমার মেয়েটা খারাপ। একটু ইশারা করলেই সর্বনাশ। আমি যদি দেখি এইসব কিছু হচ্ছে তাহলে খুন করে ফেলব হুঁ হুঁ।

এ্যালন নিজেও তাঁর মায়ের মত তিনমণি বস্তা। তাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করার ইচ্ছা হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মেয়ের মা তা বোঝে না।

মেয়েটির স্বভাব চরিত্র অবশ্যি সত্যি সত্যি ভাল না। আড়ালে পেলেই সফিকের সঙ্গে কুৎসিত সব অঙ্গভঙ্গি করে। একদিন বেশ ভাল মানুষের মত সফিককে মুভি দেখাতে নিয়ে

গেল। মুভি দেখাবার এত সাধ্য সাধনার কারণ জানা গেল মুভি শুরু হবার পর। হার্ড কোর পর্ণো মুভি একটি। মেয়েটি মেঘ স্বরে বললো, সব কায়দা কানুন যাতে শিখতে পার সে জন্যেই নিয়ে এলাম। অনেক কিছু জানার আছে।

৬

টুকটুক করে টোকা পড়ছে দরজায়।

তার মানে যে এসেছে সে পরিচিত কেউ নয়। পরিচিতরা ডোরবেল বাজায়। ডোরবেলটি এমন জায়গায় যে অচেনা কারোর চোখে পড়ে না।

আনিসের মনে হলো যে এসেছে সে একজন মহিলা। শুধুমাত্র মেয়েরাই দরজায় দু'বার টোকা দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তৃতীয়বার টোকা দেয়। ছেলেদের এত ধৈর্য নেই।

আনিস দরজা খুলে দিল। একটি মেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, মালিশা। দিনের আলোয় তাকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। তার উপর সে বেশ সাজগোজ করেছে। কাঁধে লাল টকটকে ভেলভেটের ব্যাগ। সোনালি চুলগুলিকে লম্বা বেনি করে কাঁধের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাতের আলোয় যতটা অল্প অল্প বয়েসী মনে হয়েছিল এখন অবশ্যি সে রকম লাগছে না।

তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ ?

তা পারছি। তুমি মালিশা। মালিশা গিলবার্ড।

আমি কি ভেতরে এসে বসতে পারি ?

হ্যাঁ পার।

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই বললো, তুমি সন্ধ্যাবেলা ফ্রী আছ ?

কেন বলতো ?

আমি তোমাকে কোন একটি ভাল রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে চাই। আজ আমার জন্মদিন।

শুভ জন্মদিন মালিশা।

ধন্যবাদ। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ?

আনিস ইতস্তত করতে লাগলো।

তোমার ইচ্ছা না হলে যেতে হবে না।

আনিস বললো, কোথায় যেতে চাও ?

আমার পকেটে চল্লিশ ডলার আছে। এর মধ্যে হয় এরকম কোনো রেস্টুরেন্টে। ম্যাক্সিকান খাবার তোমার পছন্দ হয় ? সেগুলি বেশ সস্তা।

ম্যাক্সিকান খাবার আমার খুব পছন্দ।

তোমাকে খুব একটা ভাল রেস্টুরেন্টে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু কী করব বল ? রোজগারপাতি নেই। হাই স্কুল পাশ করি নি। কাজেই রেস্টুরেন্টের ওয়েট্রেস আর বেবী সিটিং-এর বেশি কিছু পাই না। চল্লিশ ডলার জমাতে হলে আমাকে দু'মাস রোজ আট ঘন্টা করে কাজ করতে হয়।

আনিস বললো, তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে আমি বরং ডিনারটা কিনি।

মালিশা হেসে ফেললো।

এখন আমার অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু শীগগীরই আমি মাল্টি মিলিওনিয়ার হচ্ছি। কাজেই টাকা খরচ করতে মায়া লাগে না আমার।

আনিস বললো, মিলিওনিয়ার সত্যি সত্যি হচ্ছ তুমি ?

ইউ বেট। আমার মা ডলারের বস্তার উপর শুয়ে আছে। আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে যদি বিষটিষ খাইয়ে দেই। আমিও বুড়িকে ভজিয়ে ভজিয়ে রাখছি। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেই— মা তোমার শরীর কেমন আছে ? ঠিকমত ওষুধপত্র খাচ্ছ তো ? গরমের সময় অবশ্যই হাওয়াই থেকে ঘুরে আসবে। হা হা হা।

আনিস হেসে ফেললো। মালিশা বললো, বুড়ো বুড়ি হলেই মানুষ এরকম হয়ে যায়। ডলারই তখন প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। জীবন দিয়ে ডলার আগলে রাখে। আমার মতে পঞ্চাশ-এর উপর বয়স হলেই তাকে ঘাড় ধরে একটা নির্জন দ্বীপে ফেলে দিয়ে আসা উচিত। না না আমি খুব সিরিয়াস। জান তুমি আমার মার কত টাকা আছে ? আন্দাজ করতে পার ?

না।

মা দু'নম্বর বিয়ে করে একজন পোল ব্যবসায়ীকে। তার হচ্ছে সী কার্গোর ব্যবসা। আমার স্টেপ ফাদার মারা যাবার পর সব কিছু আমার মা পেয়েছে। তার মধ্যে আছে রাজপ্রাসাদের মত দু'টি বাড়ি। একটি ফ্লোরিডাতে অন্যটি বোহেমিয়া আইল্যান্ডে। মা সব কিছু বিক্রি করে ডলার বানিয়ে ব্যাংকে জমা করেছে। নিজে গিয়ে উঠেছে ওল্ড হোমে। সস্তায় থাকা খাওয়া যায়। বিশ্বাস করতে পার ?

বিশ্বাস করা কঠিন।

আমি তারই মেয়ে। আর দেখ চল্লিশটি ডলার খরচ করতে আমার গায়ে লাগছে।

আনিস দেখলো মেয়েটির চোখ ছলছল করছে। আমেরিকান মেয়ে কাঁদবে না ঠিকই। এরা মচকাতে জানে না। আনিস বললো, ছ'টার আগে নিশ্চয়ই তুমি খেতে যাবে না ? কফি খাও একটু ?

দাও।

কফিতে দুধ চিনি দাও তুমি ?

দু'চামচ চিনি। দুধ চাই না।

আনিস কফি বানাতে বানাতে বললো, মিলিওনিয়ার যখন হবে তখন এত টাকা খরচ করবে কীভাবে ?

প্রথমেই প্লাস্টিক সার্জারী করব। আমার বুক দুটি বড়ই ছোট। সিলিকোন ব্যাগ দিয়ে বড় করব। আমাকে দেখে অবশ্যি বোঝা যায় না আমার বুক এত ছোট। আমি অন্য ধরনের ব্রা ব্যবহার করি। ফোম ব্রা।

ও আচ্ছা।

এই ব্রাতে ছোট বুকও খুব এট্রাকটিভ মনে হয়। ব্রা খুললেই তুমি হতাশ হবে। দেখতে চাও ?

না না ঠিক আছে বিশ্বাস হচ্ছে তোমার কথা।

তাছাড়া আমার নাকটাও বেশি ভাল না। মনে হয় অনেকখানি ঝুলে আছে। তাই না?

আমার তো মনে হয় না।

তোমার সৌন্দর্যবোধ নেই তাই বুঝতে পারছ না। নাকটা অল্প একটু তুলে দিলেই সব বদলে যাবে।

কেমন বদলাবে?

যেমন ধর তখন যদি তোমাকে বলি— ব্রা খুললেই দেখবে আমার বুক দু'টি টাইনি তুমি দেখতে চাও? তুমি বলবে— তাই নাকি? কই দেখি তো?

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, মালিশা তুমি বেশ বুদ্ধিমতী।

আমার মায়েরও তাই ধারণা। মা বলেন, বুড়ো বয়সে কোনো ধনী মহিলার উচিত নয় তার মেয়েকে কাছে রাখা। বিশেষ করে সে মেয়ে যদি তোমার মত ইন্টেলিজেন্ট হয়।

কফি কেমন হয়েছে মালিশা?

ভাল।

আরেক কাপ নেবে?

দাও। তোমার নাম কিন্তু আমি জানি না।

আনিস।

তুমি কি ইন্ডিয়ান?

না বাংলাদেশ হচ্ছে আমার দেশ।

সেটা আবার কোথায়?

ইন্ডিয়ার পাশে ছোট একটা দেশ।

সেখানেও কি ইন্ডিয়ার মত লক্ষ লক্ষ মানুষ থালা হাতে খাবারের জন্য ঘুড়ে বেড়ায়?

কোথায় শুনেছ এসব?

আগে বল সত্যি কিনা। ডাস্টবিনের পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে থাকে। কখন কেউ এসে খাবার ফেলবে সেই আশায়। বল সত্যি নয়? নাকি তোমার স্বীকার করতে লজ্জা লাগছে?

আনিস ইতস্তত করে বললো, সত্যি নয়। বড় বড় অভাব হয়েছে। সেতো পৃথিবীর সব দেশেই হয়েছে। ইউরোপে হয় নি? আমেরিকাতেও তো ডিপ্রেসন হয়েছে।

আনিস তুমি রেগে যাও কেন? তোমাকে রাগাবার জন্যে আমি বলি নি।

তোমরা যা ভাব দেশটি মোটেই সে রকম নয়।

মালিশা ঠোঁট চেপে হাসলো। পরমুহূর্তে ভাল মানুষের মত বললো, ইলেকট্রিসিটি আছে?

এসব জিজ্ঞেস করছো কেন?

কারণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলতে ইচ্ছা না হলে বলবে না। আনিস গম্ভীর মুখে বললো, না মালিশা ইলেকট্রিসিটি ফিটি নেই। গাড়ি ফাড়িও নেই। শহরে বাস সার্ভিসের বদলে আছে এ্যালিফেন্ট সার্ভিস। হাতির পিঠে চড়ে যাওয়া আসা।

ঠাট্টা করছ?

তা করছি।

কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করলে আমার ভাল লাগে না। প্লীজ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবে না এবং আমি সরি।

সরি কী জন্যে ?

তোমাকে দেশের কথা বলে হার্ট করেছি সেই জন্যে। আমার যখন টাকা হবে তখন আমি তোমার দেশ দেখতে যাব।

বেশ তো।

দেশে তোমার কি বউ আছে ?

না।

কোন সুইট হার্ট ?

না তাও নেই।

আমি মনে মনে আশা করছিলাম তুমি বলবে 'না'। বিবাহিত লোকদের আমার ভাল লাগে না।

টুনটুন করে ঘণ্টা বাজছে। যে এসেছে সে যদিও ডোর বেল বাজাচ্ছে তবু লোকটি অপরিচিত। এরকম করে ঘণ্টা কেউ বাজায় না। ছোট বাচ্চাদের মত অনবরত টিপেই যাচ্ছে। আনিস দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল। নিশানাথ বাবু।

নিশানাথ বাবু ঘরে ঢুকেই মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, এই মেয়েটি বড় সুন্দর তো ? দুর্গা প্রতিমার মত চোখ। মালিশা বললো, আপনি কি আমাকে নিয়ে কিছু বলছেন ? আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন তাই জিজ্ঞেস করছি।

নিশানাথ বাবু হাসি মুখে বললেন, আমি বলছি এই মেয়েটি কে ? আমাদের এক গডেস-এর চোখের মত অপূর্ব চোখ।

মালিশা হাসি মুখে বললো, আমার নাম মালিশা। আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে আপনি কি আমার সঙ্গে দয়া করে ডিনার খাবেন ?

খাবো না কেন ?

নিশানাথ বাবুর ভাব দেখে মনে হলো তিনি খুব অবাক হয়েছেন প্রশ্ন শুনে।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে কিন্তু মাত্র চল্লিশ ডলার আছে। মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে গেলে মনে হয় এতেই তিনজনের হয়ে যাবে কী বলেন ?

টেকো খেতে আর কয় পয়সা লাগবে ? হয়েও থাকবে দেখবে।

নিশানাথ বাবু ঠিকানা যোগাড় করে কীজন্যে হঠাৎ করে আনিসের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে কেন নিশানাথ বাবু বুঝতে পারেন নি। অনেক কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না। আসতে বলা হয়েছে তিনি এসেছেন, ব্যাস। আনিস বললো, বাংলাদেশের স্টল কেমন দেখলেন ?

চমৎকার। ঐ টম ছোকরা কী সব কায়দা কানুন করে দিয়েছে আমি স্তম্ভিত। টেবিলটাতে হার্ডবোর্ড ফোর্ড লাগিয়ে রং টং দিয়ে এমন করেছে দেখে মনে হয় একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ছোকরার গুণ আছে।

মালিশা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললো, আপনার নামটা কী দয়া করে বলবেন ?

আমার নাম নিশানাথ।

এই নামের মানে কী ?

এর মানে হলো 'গড অব দ্যা ডার্কনেস'।

বাহ্ মজার নাম তো!

নিশানাথ বাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ঐ টম ছোকরার গুণ আছে। হুলুস্থুল করছে বুঝলেন নাকি আনিস সাহেব। পেছনে হার্ডবোর্ডের উপর বৃষ্টির ছবি এঁকেছে। ছবির দিকে তাকালেই বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যায়। মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে চারদিকে।

মালিশা বললো, ব্যাঙ ডাকছে মানে ?

আমাদের দেশে বৃষ্টি হলেই ব্যাঙ ডাকে। সেই শব্দ জগতের মধুরতম ধ্বনির একটি। তুমি না শুনলে বুঝতেই পারবে না।

ব্যাঙের ডাক তো আমি শুনেছি। ওর মধ্যে মধুরতার কী আছে ?এইসব তুমি কী বলছ ?

মালিশা তোমাকে বুঝানো যাবে না।

নিশানাথ বাবু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। মালিশা অবাক হয়ে বললো, আপনি অদ্ভুত লোক! সত্যি অদ্ভুত!

মালিশার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল।

মেট্রোপলিটন বাসে উঠতে গিয়ে দেখে একটার উপর বাজে। ফাঁকা বাস। সে ছাড়া অন্য কেউ নেই। একটি নব্বই বছরের বুড়ি ছিল সে টুয়েলভ স্ট্রীটে নেমে গেল। নামবার সময় বুড়িটি বললো, আমাকে একটু হাত ধরে নামিয়ে দেবে ?

মালিশা এমন ভাব করল যেন সে শুনতে পায় নি। বুড়ি দ্বিতীয়বার কিছু না বলে নিজে নিজেই নামলো। এই বয়সেও রাত দুপুরে একা একা বাসে চড়া চাই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে পাস বই ভর্তি ডলার। তবু পাঁচ ডলার খরচ করে ক্যাব ডাকবে না। দেশে একটা ফেডারেল আইন থাকা দরকার। যে আইনে সত্তুরের উপর বয়স হলে সব টাকা পয়সা সরকারের কাছে সারেন্ডার করে নির্বাসনে যেতে হবে।

বাস ডাউন টাউনে আসতেই মালিশা নেমে গেল। এখানে বাস বদল করতে হবে। বাস থেকেই মালিশা লক্ষ করলো তার হাত পা শিরশির করছে। নির্ঘাৎ আবার জ্বর আসছে। এ রকম হচ্ছে কেন ? বারবার শরীর খারাপ হচ্ছে। মালিশা মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। শরীর বেশি খারাপ হবার আগেই এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়া দরকার।

বাস স্ট্যান্ডটি ফার্স্ট এ্যাভিন্যুতে। মালিশার ইচ্ছে হল বাসের জন্যে না হেঁটে একটি ক্যাব ডাকে। সে খোলা একটি ট্যাভার্নে ঢুকে পড়লো। ক্যাব কোম্পানিকে টেলিফোন করতে হবে।

জন ট্রিভলটার রেকর্ড বাজছে উচ্চ স্বরে। কোমর জড়াজড়ি করে ডায়াসের কাছে দু'তিনটা ছেলে মেয়ে নাচছে। সেদিকে তাকিয়ে মালিশার কেমন যেন মাথা ঘুরতে লাগলো।

হ্যালো মালিশা গা গরম করবে নাকি ? নাচবে এক পাক ?

মালিশা তাকালো কিন্তু ছেলেটিকে চিনতে পারলো না।

মালিশা এসো।

নাহ্।

না কেন ?

আমার শরীর ভাল লাগছে না।

মালিশা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো চিনতে পারছে না কেন ? ছেলেটি এসে পরিচিত ভঙ্গিতে হাত ধরলো। গলার স্বর নামিয়ে বললো, যাবে না কি আমার সঙ্গে ?

কোথায় ?

আমার এ্যাপার্টমেন্টে। দু'জনের ছোট-খাট একটি পার্টি হয়ে যাবে কি বল ?

না।

না কেন ? আস। আমি তো অপরিচিত কেউ নই ? আগেওতো আমার সঙ্গে ডেটে গিয়েছো। এসো এসো খুব ফান হবে।

৭

রাহেলা দরজা খুলে দেখতে পেলেন ছ'ফুট লম্বা টম দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। খালি গা। পরনে জিনসের একটি হাফপ্যান্ট। পায়ে জুতা-টুতা কিছুই নেই।

আমি রুনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কার সঙ্গে ?

রুন, রুনকি।

রাহেলা একবার ভাবলেন বলেন রুনকি বাড়ি নেই। কোথায় গেছে জানি না। কিন্তু বলতে পারলেন না। টম ভারি গলায় বললো, তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছ না। আমার নাম টমাস গ্রে। আমি রুনের বন্ধু।

ভেতরে এসে বস আমি ডেকে দিচ্ছি।

না আমি ভেতরে এসে তোমার কার্পেট নোংরা করব না। পায়ে আমার প্রচুর ময়লা।

রাহেলা রুনকির ঘরে উঁকি দিলেন। রুনকি চুল ছেড়ে চুপচাপ বসে আছে। হালকা সুরে পোলকা মিউজিক বাজছে। রুনকির সামনে গাদা খানিক বইপত্র ছড়ানো। রাহেলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, রুনকি ?

ভেতরে এসো মা।

রুনকি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

রুনকি হাসি মুখে বললো, কথা বলতে চাইলে বল। এত গম্ভীর হয়ে আছো কেন ?

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমরা তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমার মঙ্গল চাই এই সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ আছে ?

আছে।

রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, আমি তা জানতাম না।

ঠাট্টা করছিলাম মা। তুমি ঠাট্টা বুঝতে পার না এত বড় মুশকিল!

রাহেলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি চাই না তুমি টমের সঙ্গে মেলামেশা কর।

রুনকি খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললো, টম কি এসেছে ?

রাহেলা উত্তর দিলেন না। রুনকি ঝড়ের বেগে নিচে নেমে গেল। রাহেলারও ইচ্ছা হল নিচে নামার। কিন্তু নামলেন না। নামলেই হয়ত দেখবেন দু'জন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় বাস করার পরও এই দৃশ্য তাঁর ভাল লাগে না। রাহেলা মন্থর পায়ে নিজ ঘরের দিকে এগুলেন। তার কিছুক্ষণ পর রুনকি আবার উপরে উঠে আসলো। নিজের ঘরে বসেই রাহেলা বুঝতে পারলেন রুনকি সাজগোজ করছে। হালকা সুরে শিস দিচ্ছে। মেয়েদের শিস দেয়া একটা কুৎসিত ব্যাপার।

সেই রাতে রুনকি আর বাড়ি ফিরলো না।

৮

ক্লাস থেকে বেরুনোমাত্র এন্ডারসনের সঙ্গে দেখা। এন্ডারসন লোকটি ফূর্তিবাজ। দেখা হলেই একটা মজাদার কথা বলবে কিংবা জিভ বের করে ভেংচে দেবে। কে বলবে সে হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ডের একজন বিশেষজ্ঞ— একজন ফুল প্রফেসর। আনিস বললো, হ্যালো এন্ডারসন।

এন্ডারসন একটি চোখ বন্ধ করে অন্য চোখ পিটপিট করতে লাগলো। আনিস হেসে ফেলতেই সে বললো, তোমার সঙ্গে কথা আছে আনিস। এসো কফি খেতে খেতে বলব।

কফি হাউসে তিল ধারণের জায়গা নেই। ফাইনাল এগিয়ে আসছে। ছেলেমেয়েরা বই-খাতা নিয়ে ভিড় জমাচ্ছে কফি হাউসে— কেউ টেবিল ছাড়ছে না। খুপরি ঘরগুলির একটিতে জায়গা পাওয়া গেল মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকার পর। আনিস বললো, কী বলবে বল ?

ইদানীং কি তুমি অল্প বয়সী একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

আনিস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, কী জন্যে জিজ্ঞেস করছ ?

কারণ আছে। আমেরিকা একটা ফ্রি কান্ট্রি। তুমি কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি প্রবলেম হয়েছে।

কী প্রবলেম ?

এন্ডারসন গম্ভীর মুখে বললো, মেয়েটি একটি প্রসটিটিউট।

আনিস চুপ করে রইলো। এন্ডারসন আবার বললো, তুমি প্রসটিটিউটের সঙ্গে ঘুরলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় রকমের ঝামেলা হয়। হঠাৎ একদিন হয়ত মেয়েটি তোমাকে এসে বলবে আমার পেটে তোমার বাচ্চা। এবরশনের জন্যে হাজার দশেক ডলার দরকার।

আনিস গম্ভীর মুখে বললো, জানলে কী করে মেয়েটি একটি প্রসটিটিউট ?

আমি জানি। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই মালিশা। ঠিক না ? আনিস জবাব দিল না।

জোসেফাইন পঞ্চমবারের মত সফিকের চাকরি নট করে দিলো।

তোমার মত মিনমিনে শয়তান, ফাজিল আর অকর্মাকে ছাড়াও আমার চলবে। শুক্রবার এসে পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবে।

বুড়ির রেগে যাওয়ার কারণ সফিক একজন কাস্টমারের নাকে গদাম করে ঘুসি মেরেছে। বেচারার দোষ হচ্ছে সে নাকি সফিকের দেশ বাংলাদেশ শুনে কোমরে হাত দিয়ে হায়নার মত হেসেছে। জোসেফাইন চোখ লাল করে বলেছে, হেসেছে বলেই ঘুসি মারবে ? খুশি হয়ে বেচারা হেসেছে।

খুশি হয়ে হেসেছে মানে ? এই হাসি খুশি হওয়ার হাসি ?

কীসের হাসি সেটা ? বল তুমি কীসের হাসি ?

কীসের যে হাসি তা অবশ্যি সফিকও জানে না। হয়তো বিনা কারণে হেসেছে। কিন্তু সফিকের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ যাচ্ছিল। সকাল বেলাতেই খবর পাওয়া গেছে জেমসটাউনের রকিবউদ্দিন একটি রেস্টুরেন্ট দিচ্ছে। মন খারাপ করার মত খবর নয়। কিন্তু রেস্টুরেন্টের নাম দিয়েছে 'ইন্ডিয়া হাউস'। সফিককে টেলিফোন করে বললো, বাংলাদেশের নামতো কেউ জানে না। কিন্তু ইন্ডিয়ান ফুডের নাম জগৎ জোড়া, কাজেই নাম দিলাম 'ইন্ডিয়া হাউস'। আপনি ভাই ফার্গোর সব বাঙালিদের খবর দেবেন। ইনশাআল্লাহ্ আগামী মাসেই খুলবো।

সফিক মেঘস্বরে বললো, 'ইন্ডিয়া হাউস' নাম দিয়েছেন ?

এখনো ফাইনাল করি নাই। 'ইন্ডিয়া ফুডস্'ও দিতে পারি।

অর্থাৎ ইন্ডিয়া থাকবেই ?

হ্যাঁ তা তো থাকতেই হবে।

শুনেন ভাই আপনাকে যদি আমি ফার্গোতে দেখি তাহেল আপনাকে আমি খুন করে ইলেট্রিক চেয়ারে বসবো বুঝেছেন।

আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

চুপ শালা।

সফিক টেলিফোন রেখে নিক্স প্লেসে এসেই কাস্টমারের নাকে ঘুসি বসালো। জোসেফাইন এবার সত্যি সত্যি রেগেছে। এ পর্যন্ত তিনবার বলেছে।

সফিক তোমাকে যেন আর না দেখি। যথেষ্ট হয়েছে।

সফিক নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে ইমিগ্রেশন থেকে চিঠি এসেছে, সে যেন চিঠি পাওয়ার সাত দিনের ভেতর ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারাইলেজেশন অফিসার টি রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করে।

সফিককে এ নিয়ে চিন্তিত মনে হলো না। তার মাথায় ঘুরছে কী করে হারামজাদা রহমানকে একটা উচিত শিক্ষা দেয়া যায়। একটা বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট দিয়ে ফেললে কেমন হয় ? খুব কি কঠিন ব্যাপার ? নাম দেয়া যেতে পারে 'দি মেঘনা'— এ প্লেস ফর এক্সোটিক বাংলাদেশী ফুড। কিন্তু ফুড কি এক্সোটিক হবে ? শব্দটা ঠিক আছে নাকি ? এইসব ব্যাপারে রুনকি একজন ছোট খাটো বিশেষজ্ঞ। সফিক টেলিফোন করলো তৎক্ষণাৎ। টেলিফোন ধরলেন রাহেলা।

আমি সফিক।

বুঝতে পারছি। কী ব্যাপার ?

খালা আমরা একটা রেস্টুরেন্ট দিচ্ছি। নাম হচ্ছে আপনার 'দি মেঘনা'।

কী দিচ্ছ ?

রেস্টুরেন্ট। বাংলাদেশী সব খাবার টাবার পাওয়া যাবে। আজ সন্ধ্যায় বাসায় এসে সব আলাপ করব।

রাহেলা গম্ভীর গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলা আমরা থাকব না।

ও আচ্ছা রুনকিকে একটু দেন। ওর সঙ্গে কথা বলি।

রুনকি তো নেই।

নেই মানে ?

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, তুমি কি কিছু জান না ?

না, কী জানব ?

রুনকি এখন আর আমাদের সঙ্গে থাকে না।

কোথায় থাকে তাহলে ?

রাহেলা ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, আমি জানি না কোথায় থাকে।

সফিক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো, কই আমাকেতো কিছুই বলেন নাই।

তোমাকে বলতে হবে কেন ? তুমি কে ?

রাহেলা টেলিফোন নামিয়ে রেখে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন। এই শহরে আর থাকতে পারবেন না। অনেক দূরে চলে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে আড়ালে যাতে কেউ কখনো রুনকির খোঁজে টেলিফোন করতে না পারে।

৯

রুনকি গিয়ে উঠেছে টমের ওখানে।

দুটি অবিবাহিত ছেলেমেয়ের এক সঙ্গে বাস করা এমন কিছু অবাক হওয়ার মত ঘটনা নয়। বিয়ের মত এমন একটি প্রাচীন ব্যবস্থা কী আর এত সময় পর্যন্ত ধরে রাখা যায়। এখন হচ্ছে লিভিং টুগেদার। যতদিন ইচ্ছে একসঙ্গে থাকা। যখন আর ভাল লাগছে না তখন দূরে সরে যাওয়া। কারো কোনো দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব থাকলেই ভালোবাসা শিকলে আটকে যায়। শিকলে কি আর মায়াবী পাখি ধরা পড়ে ?

টম যেখানে থাকে সেটি কোনো অ্যাপার্টমেন্ট নয়। চমৎকার একটি বাড়ি। সামনে লন আছে, ফুলের বাগান আছে, পেছনে চমৎকার সুইমিংপুল। বাড়ির মালিক এ ক'মাসের জন্যে যাচ্ছে সুইজারল্যান্ড। সে জন্যে সে বাড়ি চার মাসের জন্যে ভাড়া দিতে চায়। ভাড়া নামমাত্র মাসে চার'শ ডলার। সবটা টাকা এক সঙ্গে দিতে হবে।

টমের বাড়ি পছন্দ হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি, পছন্দ না হয়ে উপায় আছে ?

আমি নেব তোমার বাড়ি।

টমের পোশাক আশাক দেখে বাড়ির মালিক ঠিক ভরসা পায় না। গম্ভীর হয়ে বলে, ষোলশ' ডলার একসঙ্গে দিতে হবে কিন্তু।

বেশতো নিয়ে আসব বিকেলে তুমি ঘরে থাকবেতো ?

যেহেতু বিকেলে গেলে ভদ্রলোককে ঘরে পাওয়া যাবে সেহেতু টম আর বিকেলে গেল না। পরদিন দুপুরে গিয়ে হাজির। ভদ্রলোক ঘরে নেই, তার স্ত্রী দরজা খুললো। টম হাসি মুখে বললো, আমি তোমার বাড়ি ভাড়া করতে এসেছি। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

ও হ্যাঁ তোমার জন্যে সে অপেক্ষা করছিলো। তুমি কি ষোলশ' ডলার নিয়ে এসেছো।

নিয়ে এসেছি।

টম কাঁধের ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া একটি পেইন্টিং বের করলো। গম্ভীর মুখে বললো, এর দাম কম করে হলেও তিন হাজার ডলার, তোমাকে জলের দামে দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলা স্তম্ভিত।

ভয় নেই পছন্দ না হলে নগদ দাম দেব। দেখ ভাল করে।

সন্ধ্যাবেলার ছবি। পুরনো ধরনের একটি লাল রঙা ইটের বাড়ির ভাঙা জানালা দিয়ে একটি কিশোরী মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। মেয়েটির চোখে মুখে সূর্যের রক্তিম আলো। ছবি থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল। ভদ্রমহিলা আমতা আমতা করতে লাগলেন।

আমার হাসবেন্ডের সঙ্গে কথা না বলে তো রাখতে পারি না।

বেশ তাহলে নগদ দাম দিচ্ছি।

টম গম্ভীর মুখে পকেটে হাত রাখলো (পকেটে একটি মাত্র পঞ্চাশ ডলারের নোট)। ভদ্রমহিলা থেমে থেমে বললো, তারচে' এক কাজ কর, ছবিটা রেখে যাও। আমি ওর সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে জানাব।

বেশতো বেশতো।

টম জানে এই মেয়েটির স্বামীকে ছবিটি রাখতেই হবে। অবশ্যি একটি ভাল ছবি হাতছাড়া হলো। তাতে কিছুই আসে যায় না। কাউকেই ধরে রাখা যায় না। সমস্তই হাতছাড়া হয়ে যায়।

রুনকি যখন প্রথম উঠে এলো টমের ঘরে তখন টম সিরামিক্সে কিছু ফ্যান্সি পেইন্ট করছিল। দশটি টবের অর্ডার আছে, বিকাল পাঁচটার মধ্যে দিতে হবে। সময় লাগছে খুব বেশি। রুনকিকে ঢুকতে দেখে টম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, কিছু বললো না। রুনকি বললো, তোমার সঙ্গে থাকতে আসলাম টম।

বেশতো ভাল করেছ।

টম ছবি আঁকায় মন দিল। নীল রঙটা ঠিক মানাচ্ছে না। কেমন যেন লেপ্টে লেপ্টে যাচ্ছে। রুনকি গম্ভীর হয়ে বললো, আমি বাবা মা সবাইকে ছেড়ে এসেছি। তুমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছো না।

টম ডিজাইন থেকে চোখ তুলেই বললো, বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে আসাটা ঠিক হতো না। আমি বুড়ো-বুড়ি সহ্য করতে পারি না।

তুমি মন দিয়ে শুনছো না টম। দয়া করে শোন আমি কী বলছি। তাকাও আমার দিকে। প্লিজ।

টম তাকালো।

আমি তোমার জন্যে সব ছেড়ে ছুড়ে এসেছি।

রুন এটি তুমি ভুল বললে। তুমি আমার জন্যে আস নি। এসেছ নিজের জন্যে। আমি তোমাকে কখনো আসতে বলি নি। মনের মধ্যে এসব ভুল ধারণা থাকা ঠিক না। এতে পরে কষ্ট পাবে।

রুনকি জবাব দিল না। টম বললো, চট করে কফি বানিয়ে আনতো দেখি আমার জন্যে। চিনি দু'চামচ চাই নো ক্রিম।

বাইরে থেকে টমকে ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া মনে হলেও আসলে সে মোটেও সে রকম নয়। রুনকি অবাক হয়ে দেখলো টমের অত্যন্ত গোছালো স্বভাব। সিগারেট খেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে রাখে না। হৈ-চৈ হুল্লোড় কিছুই করে না। রুনকির ঘুম ভাঙার আগেই সে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ছবি নিয়ে বসে। ঘণ্টা তিনেক এক নাগাড়ে কাজ করে। এই সময় তার মূর্তি ধ্যানী পুরুষের মূর্তি। কথা বললে জবাব দেবে না। চা খাবে না সিগারেট খাবে। সকালের কাজ শেষ হলেই ঘণ্টা খানেক শুয়ে থাকবে চুপচাপ। তার ভাষায় এটি হচ্ছে মেডিটেশন। বারোটা নাগাদ লাঞ্চ তৈরি হবে। লাঞ্চ শেষ করেই বেরুবে কাজের খোঁজে। সারাদিন কাজ পাওয়া যায় না। ঘোরাঘুরিই সার। তখন সে তার আঁকা চমৎকার একটি ছবি রাস্তার মোড়ে টাঙিয়ে বসে থাকবে। ছবির নিচে বড় বড় হরফে লেখা— 'একজন দুরারোগ্য ক্যান্সারে মরণাপন্ন শিল্পীকে সাহায্যের জন্যে ছবিটি কিনুন। এই শিল্পী গনিনের মত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন কিন্তু হায় ভাগ্যের কী ছলনা!' ছবি বিক্রি হয়ে যায় চট করে। যে কোনো ছবি বিক্রি হলেই টমের খানিক মন খারাপ হয়। বিড়বিড় করে নিজের মনে— কিছুই ধরে রাখা যাচ্ছে না। কোনো কোনোদিন মন খারাপের তীব্রতা এতই বাড়ে যে সে হুইস্কি খেতে খেতে চোখ লাল করে বাড়ি ফেরে। রুনকিকে গম্ভীর হয়ে বলে, প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলাম কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। লাল হচ্ছে আমার সবচে' ফেভারিট কালার অথচ লাল রঙের ব্যবহারটা এখনো শিখতে পারলাম না। এরকম জীবনের কোনো মানে হয়?

এই জাতীয় কথাবার্তার কোনো অর্থ হয় না বলাই বাহুল্য। তবু রুনকির ভয় করে। বড় শিল্পী না হওয়াই ভাল। টম আর দশজন মানুষের মত সহজ স্বাভাবিক মানুষ হোক। সংসারে ভালোবাসা থাকুক সুখ থাকুক। খ্যাতির কি সত্যি কোনো প্রয়োজন আছে?

টম অবশ্যি রুনকিকে খুব পছন্দ করে। তবু রুনকির ভয় কাটে না। সব সময় মনে হয় একদিন সে হয়ত ভাল মানুষের মত ঘর থেকে বেরুবে আর ফিরবে না। পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ আছে যাদের ভালোবাসা দিয়ে ধরে রাখা যায় না।

রুনকি নিজেকে মানিয়ে নিল খুব সহজেই। বাজার করা, রান্না করা, কোনো কিছুই আর আগের মত জটিল মনে হল না তার কাছে। বাইরে বেরুলে একটি ক্ষীণ অস্বস্তি অবশ্যি থাকে মনের মধ্যে— যদি পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয়। সবচে' ভাল হত যদি টমকে নিয়ে বহু দূরে কোথাও চলে যাওয়া যেত। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট কোনো একটি দ্বীপে। যেখানে জনমানুষ নেই। সারাক্ষণ হুহু করে হাওয়া বইছে। সন্ধ্যাবেলা আকাশ লাল করে সূর্য ডুবে হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

টমের এই বাড়িটিও অবশ্যি দ্বীপের মতই। শহরের বাইরে খোলামেলা একটা বাড়ি। কেউ ঠিকানা জানে না বলেই কেউ আসে না। রুনকি মাকে টেলিফোন করে ঠিকানা দিতে চেয়েছিল। রাহেলা শান্ত স্বরে বলেছেন, তোমাদের ঠিকানার আমার কোনো প্রয়োজন নেই

রুনকি। তোমার ঠিকানা তোমার কাছেই থাকুক।

ঠিকানা না রাখলে টেলিফোন নাম্বার রাখ।

রাহেলা উত্তর না দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছেন।

কেউ জানে না রুনকি কোথায় আছে তবু একদিন সফিক তার ভাঙা ডজ গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত। রুনকির বিস্ময়ের সীমা রইলো না। সফিক গাড়ি থেকে নেমেই বললো, বাংলাদেশী কায়দায় তোমাদের একটা বিয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে আসলাম। গায়ে হলুদ টলুদ সব হবে। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে রুই মাছ যাবে— গায়ে হলুদের তত্ত্ব। দেশের একটা পাবলিসিটি হয়ে যাবে। মেলা লোকজনকে বলা হবে কী বল?

রুনকি বহু কষ্টে হাসি সামলায়।

টম বুঝি রাজি হবে! তোমার যে কী সব চিন্তাভাবনা সফিক ভাই।

রাজি হবে না মানে? টমের ঘাড় রাজি হবে। ব্যাটা দেশের একটা বেইজ্জতি করে ফেলেছে। বাংলাদেশী মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে...।

রুনকি গম্ভীর মুখে বললো, সফিক ভাই, টম কাউকে ভাগিয়ে টাগিয়ে আনে নি। আমি নিজেই এসেছি। আর আমার জন্যে তোমার বাংলাদেশের কোনো বেইজ্জত হয় নি। আমি বাংলাদেশী নই। আমি বাই বার্থ আমেরিকান। আমার বাবা মা'র মত নেচারালাইজড সিটিজেন না।

সফিক সারাদিন তাকলো রুনকির ওখানে। 'দি মেঘনা রেস্টুরেন্ট' খোলার ব্যাপারে তার রুনকির সাহায্যের দরকার। হুলস্থুল কাণ্ড করতে হবে সেখানে। লাঞ্চ ও ডিনারের টাইমে পল্লীগীতির সুর বাজবে। বাংলাদেশের বিখ্যাত সব শিল্পীদের তেল রঙের নিসর্গ দৃশ্যের ছবি দিয়ে সাজানো হবে লবি। খাওয়ার শেষে হাতে তুলে দেয়া হবে এক খিলি পান এবং খাঁটি বাংলায় বলা হবে— 'আবার আসবেন'।

কিন্তু টাকাটা তুমি পাচ্ছ কোথায়?

সবার কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে যোগাড় হবে। তোমাকেও দিতে হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।

আমার কাছে আছেই কুল্যে একশ' ডলার।

দাও একশ' ডলারই সই। তোমাকে দিয়েই শুরু।

সারাদিন অপেক্ষা করেও টমের দেখা পাওয়া গেল না। সে আসবে রাত আটটায়। রুজভেল্ট স্কুলের কী একটা ডেকরেশনের কাজ নাকি পেয়েছে। শেষ করে ফিরবে।

১০

অক্টোবর মাস।

বরফ পড়ার সময় নয় কিন্তু আবহাওয়া অফিস বলেছে তুষারপাত হতে পারে। সম্ভাবনা শতকরা বিশ ভাগ। আকাশ অবশ্যি পরিষ্কার। ঝকঝকে রোদ। সন্ধ্যার আগে আগে দেখা গেল সব ঘোলাটে হয়ে আসছে। সাড়ে ছ'টা থেকে ঝুর ঝুর করে বরফ পড়তে শুরু করলো।

বৎসরের প্রথম বরফ, খুশীর ঢেউ খেলে গেলো চারদিকে। ছেলে বুড়ো সবাই চোখ বড় বড় করে বলছে— আহ্ কী চমৎকার তুষার পড়ছে। হাউ লাভলী।

রাত ন'টার খবরে বললো— কানাডা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে আর উষ্ণ হাওয়া আসছে সাউথ থেকে কাজেই সারারাত ধরে ব্লিজার্ড হতে পারে। ইতিমধ্যে এক ফুটের মত বরফ পড়েছে। রাস্তা-ঘাট পিছল। কেউ যেন বিনা প্রয়োজনে বাইরে না যায়। হাইওয়ে আই নাইন্টি বন্ধ। বড়ই ফুর্তির সময় এখন। শুরু হবে ব্লিজার্ড পার্টি। উপকরণ সামান্য বিয়ার, বাদাম ভাজা এবং চড়া মিউজিক। বৎসরের প্রথম ব্লিজার্ডকে স্বাগত জানানোর এই হচ্ছে ফার্গোর সনাতন পদ্ধতি।

আনিস মোটা একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে সোফায় আরাম করে বসলো। ঘরে একটি ফায়ার প্লেস আছে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানোর কায়দা কানুন তার ভাল জানা নেই। চিমনি পরিষ্কার আছে কিনা কে জানে। এর চেয়ে কম্বল জড়িয়ে থাকাই ভাল। কফি পটে কফি গরম হচ্ছে। টিভিতে দেখাচ্ছে ডেভিড কপার ফিল্ডের ম্যাজিক। হাতের কাছে দুটি রগরগে ভূতের বই। একটি স্টিফেন কিংয়ের 'সাইনিং'। নিউইয়র্ক টাইমস-এর মতে কোনো সুস্থ লোক এই বই একা একা পড়তে পারে না। অন্যটি ডিমস কিলেনের 'দি আদারনুন'। পিশাচ নিয়ে লেখা রক্ত জল করা উপন্যাস। ব্লিজার্ডের রাতের জন্যে এর চেয়ে ভাল প্রস্তুতি কল্পনাও করা যায় না।

আনিস জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো। বরফে সমস্ত ঢেকে গেছে। বাতাসের সঙ্গে উড়ছে বরফের কণা। গাছের পাতায় মাখনের মত থরে থরে তুষার জমতে শুরু করেছে। একটি ধবধবে সাদা রঙের প্রকাণ্ড চাদর যেন ঢেকে ফেলেছে শহরটিকে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা চাদর নৌকার পালের মত কাঁপছে তিরতির করে। অপূর্ব দৃশ্য। চোখ ফেরানো যায় না। আনিস মন্ত্রমুগ্ধের মত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। মালিশা গিলবার্ড এসে উপস্থিত হলো এই সময়।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও তার গায়ে পাতলা একটা উইন্ড ব্রেকার ছাড়া আর কিছুই নেই। কালো একটা স্কার্ফে কান দুটি ঢাকা। হাতে খাবারের একটি প্যাকেট। মালিশা বললো, আমি ভাবলাম কেউ নেই, অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি ঘরে তোমার বান্ধবীরা কেউ আছে বুঝি?

আনিস বললো, ভেতরে এসো। এরকম দিনে বেরুলে কী জন্যে?

মালিশা বললো, তুমি কথার জবাব দাও নি। ঘরে কী তোমার বান্ধবীরা কেউ আছে?

না তা নেই।

যাক আমি শুধু দুজনের জন্যে খাবার এনেছি।

মালিশা খানিকটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে প্যাকেট খুলতে শুরু করলো।

আনিস বললো, স্কার্ফটা খুলে মাথা মুছে নাও। এত তাড়া কীসের মালিশা?

তাড়া আছে। দুপুরে খাই নি কিছু। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে আছে। গরম করতে দিয়ে তারপর হাত-মুখ ধোব।

খাবার বিশেষ কিছু নয়। বড় একটি প্যান পিজা, কয়েকটি মেক্সিকান টেকো এবং এক বোতল সস্তা বারগুন্ডি। আনিস বললো, কোনো বিশেষ উপলক্ষ আছে কি মালিশা?

আজ আমার জন্মদিন।

আনিস হাসি মুখে বললো, দু'মাস আগে একবার তুমি জন্মদিনের খাবার খাইয়েছ।

ঐ দিন মিথ্যা বলেছিলাম। তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। জন্মদিনের অজুহাত দিয়ে নিয়ে গেলাম।

এম্নি বললে বুঝি যেতাম না?

না। আমি ভাল মেয়ে না। আমার সঙ্গে বেরুতে হয়তো তোমার সংকোচ হবে।

মালিশা দ্রুত হাতে খাবার ওভেনে ঢুকিয়ে মাথার চুল মুছতে শুরু করলো।

হঠাৎ করে এসেছি বলে রাগ করনি তো? টেলিফোন করবো ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম টেলিফোনে তুমি বলে বসতে পার— আমি ব্যস্ত। সামনাসামনি কেউ এমন কথা বলতে পারবে না। আনিস তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ।

বিরক্ত হব কেন? কিন্তু জন্মদিনের কেক কোথায়?

কেক কেনা গেল না। টাকা কম পড়ে গেল। তাছাড়া কেক আমার ভালও লাগে না।

আনিস লক্ষ করলো মালিশার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। একটু যেন ঢুলছে।

তুমি কি প্রচুর ড্রিংক করেছ মালিশা?

প্রচুর নয় তবে করেছি। একা একা ভাল লাগছিলো না।

টেলিফোন করলেই একটা কেকের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আবহাওয়ার যা ধরন-ধারণ কেউ কি অর্ডার নেবে? চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আনিস বসবার ঘরে চলে আসলো। গলা উঁচু করে বললো— তুমি খাবার সাজাও মালিশা। আমি একটা টেলিফোন সেরে আসছি। অর্ডার ওরা নিল। বললো এক ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে যাবে। শুধু কেক নয় দশটি লাল গোলাপের একটি তোড়াও আসবে সেই সঙ্গে। আনিসের মনে হলো সে নিজেও খুব নিঃসঙ্গ। মালিশা হঠাৎ করে আসায় তার খুবই ভাল লাগছে। একটা কেমন যেন অন্য ধরনের আনন্দ।

আনিস, পিজা তোমার ভাল লাগেতো?

খুব লাগে।

সস্তার মধ্যে খুব ভাল খাবার তাই না?

তা ঠিক।

মালিশা হাসি মুখে বললো, আমার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটি মেয়ের জন্মদিনে কোনো লোকজন নেই কেউ বিশ্বাস করবে এ কথা? জন আসবে বলেছিলো, আমি এইসব কিনেছিলাম জন এবং আমার জন্যে। তার নাকি হঠাৎ মাইগ্রেন পেইন শুরু হয়েছে।

আনিস বললো, জন কে?

আমার একজন বন্ধু। সিয়ারসে কাজ করে। তোমার কি মনে হয় ওর সত্যি সত্যি মাইগ্রেন পেইন?

আনিস উত্তর দিল না।

মালিশা বললো, জনের একজন নতুন বান্ধবী হয়েছে। একটি মেক্সিকান মেয়ে। ও নির্ঘাত ওর সঙ্গে ঝুলাঝুলি করছে। তোমার কী মনে হয়?

আমার পক্ষে বলা মুশকিল। নির্ভর করে জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় কী রকম তার ওপর।

পর পর চার শনিবার ডেট করেছি। জন নিজেই ডেট চেয়েছে। দু'রাত ঘুমিয়েছি ওর সঙ্গে। ওটা ঠিক হয় নি। ওতে দাম কমে যায়। তাছাড়া ঐ মেক্সিকান মেয়েটিকে তো তুমি দেখ নি। দারুণ ফিগার। পুরুষের কাছে ফিগারটাই আসল।

আনিস প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললো, তোমার মা কেমন আছে?

ভালই। গত সপ্তাহে চিঠি পেয়েছি। বুড়ির শখ হয়েছে বিশ্ব ভ্রমণের। একজন সঙ্গীও পেয়েছে— জিম ডগলাস। মনে হয় ঐ বুড়ো ফুঁসলে ফাঁসলে নিয়ে যাচ্ছে। টাকার গন্ধ পেয়েছে বুঝলে না? দু'জনে ফট করে বিয়েও করে বসতে পারে। তাহলে বড়ই ঝামেলা হবে। হয়ত দেখা যাবে কিছুই পেলাম না। আমার যা ভাগ্য।

কোথায় যাচ্ছেন তোমার মা?

কে জানে কোথায়? আমি লিখেছি— যাও মা ঘুরে আস। তোমার ভাল লাগাই আমার ভাল। এবং ডগলাস সাহেব যখন যাচ্ছেন তখনতো তোমার খুব ফান হবে। মনের কথা নয় বুঝতেই পারছ সবই বানানো।

মালিশা খাবার কিছুই স্পর্শ করলো না। ঢকঢক করে এক গ্লাস বারগুন্ডি খেয়ে ফেললো। তার মনে হয় নেশা হয়েছে। চোখের কোণ লালাভ।

শোন আনিস, আমার মনে হয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। হাসছ কেন? তোমার কি ধারণা আমার নেশা হয়েছে? মোটেই নয়।

আনিস বললো, কফি খাবে?

না।

শোন আনিস। আমার মিলিওনিয়ার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? ভালই হবে তোমার।

আনিস হাসতে হাসতে বললো, টাকার জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে হবে কেন? তোমার নিজের দাম তো কিছু কম নয়।

আমাকে খুশি করার জন্যে বলছ?

না। নিশানাথ বাবুর কথা মনে নেই, তিনি বলেছিলেন তোমাকে দেখতে ইন্ডিয়ান গডেসের মত লাগে।

আমার মনে আছে আনিস। আমার যখন টাকা হবে তখন আমি ঐ ইন্ডিয়ান ভদ্রলোককে একটি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি কিনে দেব। ওর কি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি আছে?

না, ওর সে সবের বালাই নেই।

ম্যাকের স্কাইলার্ক গাড়ি ছিল। ম্যাক ছিল দারুণ বড় লোক। ওর সঙ্গে আমি অনেকবার ডেটে গিয়েছি। ও আমাকে একটা ড্রেস কিনে দিয়েছিল যার দাম দু'শ পঁচাত্তর ডলার। আমি তোমাকে দেখাব।

আনিস চুপ করে রইলো। মালিশা মনে হল একটু টলছে। আনিস বললো, আর খেয়ো না মালিশা।

কেন খাব না কেন?

বেশি হয়ে যাচ্ছে। তোমার হাত কাঁপছে।

হাত কাঁপছে কারণ আমার জ্বর আসছে। আমার শরীর বেশি ভাল না।

ডাক্তার দেখিয়েছ ?

না। ডাক্তার দেখাবার মত কিছু নয়, তাছাড়া আমার হেলথ ইনস্যুরেন্স নেই। ডাক্তারের কাছে গেলেই গাদা খানিক ডলার লাগবে। সেটা কে আমাকে দেবে ? তুমি নিশ্চয়ই দেবে না। হা হা হা।

কেক চলে আসলো দশটার দিকে। সিলোফেন কাগজে মোড়া দশটি লাল টুকটুকে গোলাপ। মালিশা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে দেখলো ফুলগুলি। আনিস হাসি মুখে বললো, শুভ জন্মদিন মালিশা।

মালিশা জবাব দিল না। তার চোখে জল আসছে। সে তা গোপন করবার জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

১১

এ বৎসর প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

ফার্গোতে যারা বসবাস করে তাঁরা পর্যন্ত বলছে— নেস্টি ওয়েদার। ফেব্রুয়ারি মাসেই চার ফুটের মত বরফ জমেগেল শহরে। সন্ধ্যার পর লোকজন আর ঘর ছেড়ে বের হয় না। কেউ সে শপিং-এ গিয়ে ঘুরে ফিরে মন তাজা করবে সে উপায় নেই। ঘণ্টা খানিক গাড়ি ঠাণ্ডায় পড়ে থাকলেই আর স্টার্ট নেবে না। বড় বড় উইন্টার সল হচ্ছে সেখানে পর্যন্ত লোকজন নেই।

টমের দিনকাল বেশ খারাপ হয়ে গেল। কাজ নেই। গোটা ফেব্রুয়ারি মাসে বাচ্চাদের বইয়ের একটি ইলাশট্রেশন ছাড়া আর কোনো কাজ জুটলো না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি বিক্রিও বন্ধ। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পায়ে হেঁটে কেউ চলাফেরা করে না। সবাই বের হয় গাড়ি নিয়ে। কার দায় পড়েছে গাড়ি থামিয়ে ছবি কিনবে ? সবচে' বড় অসুবিধা হচ্ছে বাড়িটি ছেড়ে শহরতলির একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিতে হয়েছে। সেখানে রান্নাঘর এবং বাথরুম শেয়ার করতে হয়। টম বেশ কয়েকবার বলেছে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে কিন্তু বলা পর্যন্তই। সে নাকি বরফে ঢাকা শহরের কয়েকটি ছবি এঁকেই বিদায় হবে। ছবি এঁকে ফেললেই হয়। কিন্তু এখনো তার মনমত বরফ জমা হয় নি।

প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত একটি শহরের ছবি আঁকব তারপর বিদায়। বুঝলে রুনকি এখনো সময় হয় নি।

পরাজিত হবার আর বাকি কোথায় ?

অনেক বাকি। এখনো বাকি আছে।

এই অ্যাপার্টমেন্টটিতে রুনকির গা ঘিনঘিন করে। যে মেয়েটির সঙ্গে রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হয় সে সবকিছু বড় ময়লা করে রাখে। গভীর রাত পর্যন্ত হাই ভল্যুমে গান শুনে। সময়ে অসময়ে টমের কাছে সিগারেট চায়। ভাল লাগে না রুনকির। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। প্রায়ই অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়িতে মদ খেয়ে লোকজন গলা ফাটিয়ে চেঁচায়। কিছুদিন আগেই পুলিশ এসে ছ'নম্বর ঘর থেকে একটি লোককে ধরে নিয়ে গেল। এ জায়গা ছেড়ে

কোথাও যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়। কিন্তু যাবার উপায় নেই। এরচে' সস্তায় ফার্গোতে অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যাবে না। টম নিজেও অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। কিন্তু ওর হাত একেবারেই খালি। অবস্থা এরকম চললে আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের জন্যে হাত পাততে হবে। টমের তাতে খুবই আপত্তি।

আমি কি ভিখিরি যে আন-এমপ্লয়মেন্ট নেব ?

যখন কিছুই থাকবে না তখন কী করবে ?

তখন অন্য কোথাও যাব। এই নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

কোনো কাজ টাজ করে টমকে সাহায্য করার ইচ্ছা হয় রুনকির কিন্তু শীতের সময়টায় কাজ পাওয়া খুব মুশকিল। একটি কাজ পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ ফার্গোতে। গাড়ি ছাড়া এতদূর যাওয়ার কোনোই উপায় নেই। বাস ঐ লাইনে যায় না। টমের গাড়িও নেই। দিন রাত ঘরেই বসে থাকতে হয় রুনকির। ইনিভার্সিটির ক্লাশ বাদ দিতে হয়েছে। উইন্টারকোয়ার্টারে নাম রেজিস্ট্রি করা হয় নি। ধারে সাতশ' ডলার যোগাড় করা গেল না।

টম কাজের খোঁজে সারাদিন ঘুরাঘুরি করে। রুনকি ঘরেই থাকে। ভাল লাগে না। টম সেদিন বললো, তুমি বাবা-মা'র কাছে ফিরে যাও রুনকি।

কেন ?

তোমার এখানে আর মন লাগছে না।

আমি কি বলেছি মন লাগছে না ?

বলতে লজ্জা লাগছে বলে বলছ না। বাবা-মা'র কাছে ফিরে যেতেও তোমার লজ্জা লাগছে। লজ্জার কিছু নেই রুনকি।

তুমি বড্ড বাজে কথা বল টম।

টম হেসে বলেছে, এইটি তুমি ভুল বললে রুনকি। বাজে কথা আমি কখনো বলি না। তোমার মধ্যে দ্বিধা দেখতে পাচ্ছি বলেই বলছি।

তোমার কি ধারণা আমি আর তোমাকে ভালোবাসি না ?

সে কথা আমি বলি নি রুন।

তুমি কি আমাকে ভালোবাস ?

তুমি খুব চমৎকার একটি মেয়ে। তোমাকে যে কেউ ভালোবাসবে।

তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাও নি।

আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি রুনকি।

যদি সত্যি ভালোবাস তাহলে প্লিজ চল অন্য কোথাও যাই।

আর কয়েকটা দিন, প্রকৃতির কাছে শহরের পরাজয়ের ছবিটা শেষ করেই রওনা হব।

রুনকির এখন মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে মা'র সঙ্গে গিয়ে কথা বলে কিন্তু সাহস হয় না। তার দিকে তাকিয়েই মা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলবেন ব্যাপারটা। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

সফিক এসেছিল সেদিন, সে শুধু বললো, বাহ্ স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে তোমার রুনকি।

রুনকি একবার ভাবলো সফিককে বলবে ব্যাপারটা ? কিন্তু বলতে বলতেও সামলে

গেল। টমকে আগে জানানো উচিত। টমের আগে অন্য কারোর জানা ঠিক নয়।

সফিক আসলেই অনেক খবর পাওয়া যায়। সমস্তই বাংলাদেশের খবর।

বুঝলে রুনকি, জিয়াউর রহমান সাহেবের নাম হয়েছে এখন 'জিয়াউর রহমান খাল কাটি'। শুধুই খাল কাটছে।

জিয়াউর রহমান কে ?

মাই গড। আমাদের প্রেসিডেন্ট। ফেরেশতা আদমি।

তাই নাকি !

বেচারার একটা হাফ শার্ট আর দুটো ট্রাউজার আর কিছুই নাই।

কী যে তুমি বল সফিক ভাই।

এইতো বিশ্বাস হলো না। মিথ্যা বলব কেন খামাখা। একটা পয়সা বেতন নেয় না গভর্নমেন্টের কাছ থেকে।

বেতন না নিলে চলে কী করে ?

চলে আর কোথায় ? কিছুই চলে না। দেশের জন্য লোকটার জান। নিজের দিকে তাকাবার সময় আছে ?

সফিক এলে রুনকি কিছুতেই যেতে দেয় না। বাংলাদেশী রান্না রাঁধতে চেষ্টা করে। ভাত রান্না হয় সেদিন।

রান্না কেমন হয়েছে সফিক ভাই ? মা'র মত হয়েছে ?

চমৎকার। ফার্স্ট ক্লাস।

ভাতটা বেশি নরম হয়ে গেছে না ?

নরমই আমার কাছে ভাল লাগে। চাবানোর দরকার হয় না। মুখে ফেললেই হড় হড় করে নেমে যায়।

চাকরি পেয়েছো সফিক ভাই ?

না জোসেফাইনকে খুব তেলাচ্ছি, কাজ হচ্ছে না।

অন্য কোথাও চেষ্টা কর।

গ্রিন কার্ড নেই কাজ দেবে কে আমাকে ? গভীর সমুদ্র।

সেবার যে বলেছিলে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে একটা কাজ পাবে ?

সম্ভাবনা চল্লিশ পারসেন্ট। বাঁদরের দেখাশোনা। খাঁচা পরিষ্কার রাখা। ওদের ব্যালেন্সড ডায়েট দেয়া। ডঃ লুইসের হাতেই সব, দেখি ব্যাটাকে ভজানো যায় কিনা। শালার দয়া মায়া কিছুই নাই শরীরে। দুঃখের কথা বলেও লাভ হয় না।

পরাজিত শহরের ছবি টমের আঁকা হলো না। মন্টানার ছোট্ট একটি শহরে কাজ পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোক পাহাড়ের ওপর চমৎকার একটি শীতাবাস বানিয়েছেন তার লবির ডেকোরেশন। কাজটি লোভনীয়। কারণ যতদিন কাজ শেষ না হচ্ছে ততদিন শীতাবাসে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। পাশেই স্কি করবার স্পট। জমে যাওয়া একটি হ্রদ আছে। সেখানে উইন্টার ফিসিং-এর ব্যবস্থা আছে। বরফ খুঁড়ে ছিপ ফেললেই প্রকাণ্ড সব কার্প ধরা পড়ে। টম রাজি হয়ে গেল। পরাজিত শহরের ছবি পরেও আঁকা যাবে। রুনকিকে অবাক করে দিয়ে

এক সন্ধ্যায় শ্যাম্পেনের একটি বোতল নিয়ে আসলো, এসো রুনকি সেলিব্রেট করা যাক।

কীসের সেলিব্রেশন ?

তোমার বাচ্চা আসছে সেই সেলিব্রেশন।

রুনকি দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারলো না।

তুমি কখন জানলে ?

সেটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট ?

শ্যাম্পেনে মুখ খোলা মাত্রই কর্কটি বহুদূর ছুটে গেল। টম হেসে বললো, আমার বাচ্চা খুব ভাগ্যবান হবে। আর শোন রুনকি আমার মনে হয় আমাদের বিয়ে করা উচিত। ম্যারেজ লাইসেন্স এখান থেকেই নিয়ে যাব। হানিমুন হবে মন্টানায় ঠিক আছে ? না কি তুমি আন-মেরিড হতে চাও ?

রুনকি জবাব দিল না। টম বললো, তোমাকে বিয়ের পর আমার বাবা-মা'র কাছে নিয়ে যাব। সিয়াটলে থাকেন তারা। তাদের ছোট একটা ফার্ম আছে তোমার ভাল লাগবে। তবে যেতে হবে গরমের সময়। তখন ওয়েদার ভাল থাকে। ও কী রুনকি কাঁদছো কেন ?

মন্টানায় যাবার আগে রুনকি দেখা করতে গেল মা'র সঙ্গে। রাহেলা দরজা খুলে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

কী মা ঘরে ঢুকতে দেবে না ?

রাহেলা কথা বললেন না দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

বাবা কোথায় ?

মেনিয়াপলিস গিয়েছে।

কবে ফিরবে ?

সোমবার।

ও তাহলে আর দেখা হচ্ছে না। আমরা মন্টানা চলে যাচ্ছি মা। রাহেলা চুপ করে রইলেন। রুনকি ওভারকোট খুলতেই শান্ত স্বরে বললেন, মা হচ্ছো তাহলে।

হ্যাঁ হচ্ছি। তোমার এমন মুখ কালো করবার দরকার নেই মা। আমরা বিয়ে করছি। ম্যারেজ লাইসেন্স যোগাড় হয়েছে। বিয়েতে আসবে না জানি তবু কার্ড পাঠাব।

রুনকি টাওয়েল দিয়ে মাথার চুল মুছলো। হালকা গলায় বললো, কফি খাওয়াবে যা ঠাণ্ডা বাইরে।

রাহেলা কফির পট বসালেন। রান্নাঘর থেকেই থেমে থেমে বললেন, তোমার পড়াশোনার পাঠ তাহলে চুকেছে।

আবার শুরু করবো। তাছাড়া...

তাছাড়া কী ?

পুঁথিগত পড়াশোনার তেমন দাম নেই মা। পৃথিবীতে যত টেলেন্টেড লোক জন্মেছে তাদের কারোর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ছিল না।

তা ছিল না কিন্তু ওদের টেলেন্ট ছিল। তোমার তা নেই। রুনকি হাসলো। কথার উত্তর

না দিয়ে কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চলে গেল দোতলায় তার নিজের ঘরে। ঘরটি রাহেলা চমৎকার করে সাজিয়ে রেখেছেন। দেখেই মনে হবে এই বাড়ির মেয়েটি হয়ত কলেজে গিয়েছে ফিরে আসবে এক্ষুণি।

রুনকি দেখলো তার ব্যবহারি কাপড়গুলি পর্যন্ত ইস্ত্রি করে রাখা হয়েছে। বার্বি ডল দু'টি মা নিচ থেকে নিয়ে এসে তার ঘরে রেখেছেন। দেয়ালে রুনকির ছোটবেলার একটি ছবি—ববল গাম দিয়ে বল বানানোর চেষ্টা করছে রুনকি।

রাহেলা শুনলেন উপরে গান বাজছে। কিংস্টোন ট্রায়োর বিখ্যাত গান,

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the hills we will climb
Where the seasons out of time

তিনি নিঃশব্দে উপরে উঠে আসলেন। রুনকি কার্পেটে পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে। ক্লান্ত বিষণ্ণ একটি ভঙ্গি। কাঁদছে নাকি ? রাহেলা বললেন, রুনকি তুমি কি দুপুর খাবে এখানে ?

রুনকি চোখ মুছে ধরা গলায় বললো, না মা দুপুরে আমরা রওয়ানা হব। টম এসে এখান থেকে তুলে নেবে আমাকে।

তুমি যদি তোমার কোনো জিনিসপত্র নিতে চাও নিতে পার।

মা, আমি কিছুই নিতে চাই না। রুনকি চোখ মুছে বললো, তুমি কি আমার বাচ্চাটির জন্যে দুটি নাম দেবে ? একটি ছেলের নাম একটি মেয়ের নাম।

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমার নাম তোমাদের পছন্দ হবে না রুনকি। তোমরা নিজেরা নাম বেছে নাও।

কেন তুমি এত রেগে আছ মা ? তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি ?

দূরে গেছ অনেক আগেই। নতুন করে বোঝাবুঝির কিছু নেই।

রুনকি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, যাবার আগে পুরনো দিনের মত তুমি কি আমাকে একটি চুমু খাবে মা ? প্লিজ!

১২

নিশানাথ বাবু খুব সকালে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন।

উদ্দেশ্য আশেপাশের গ্যারেজ-সেলগুলি খুঁজে দেখা। প্রি-উইন্টার গ্যারেজ সেল শুরু হয়েছে। বুড়ো বুড়ির দল অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাড়ির গ্যারেজে সাজিয়ে বসে আছে। মূল্য নামমাত্র। নিশানাথ বাবু সকাল থেকেই এ সব দেখে বেড়াচ্ছেন। গ্যারেজ সেলে ঘুরে বেড়ানো তাঁর বাতিকের মত। যে সব জিনিস তিনি গত চৌদ্দ বছরে কিনেছেন তাঁর মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পিয়ানো পর্যন্ত আছে। এম স্ট্রিটের দোতলা বাড়ি গ্যারেজসেলে কেনা জঞ্জাল দিয়ে তিনি ভর্তি করে ফেলেছেন। নতুন কিছু কিনে রাখবার জায়গা নেই তবু কিনছেন।

আজ তার একটি ফুলদানি পছন্দ হল। জার্মান সিলভারের ফুলদানি। খুব সুন্দর কাজ। দাম লেখা আছে এক ডলার।

এরচে' কমে দিতে পার ? এক ডলার বড্ড বেশি মনে হচ্ছে।

যে বুড়ো জিনিসপত্র সাজিয়ে বসে আছে সে অবাক হয়ে বললো, এক ডলার কি যথেষ্ট কম নয় ডঃ নিশানাথ ?

নিশানাথ বাবু দেখলেন বুড়ো হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিকসের স্ট্যানলি। মাংকি ক্যাপে সমস্ত মুখ ঢেকে রেখেছে বলে চেনা যাচ্ছে না।

গুড মর্নিং স্ট্যানলি।

গুড মর্নিং। কফি খাবে ? গ্যারাজ সেল উপলক্ষে কফি পাওয়া যাচ্ছে। পঞ্চাশ সেন্ট চার্জ, ফ্রি রিফিল। নিশানাথ বাবু পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে এক পেয়ালা কফি নিলেন।

বিক্রি টিক্রি কেমন ?

মন্দ নয় সাড়ে ন'ডলার বিক্রি করেছি। বস তুমি ঐ চেয়ারটাতে বস।

নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে স্ট্যানলির দিকে তাকালেন। এই লোকটি মাসে চার হাজার ডলারের মত পায়। দুপুরের একটা সাদাসিধা লাঞ্চের জন্যেই খরচ করে ত্রিশ চল্লিশ ডলার। অথচ সে বাড়ির যত সব জঞ্জাল সাজিয়ে সাড়ে ন'ডলার বিক্রি করে কী খুশি।

স্ট্যানলি ভারি স্বরে বললো, ওল্ড হোমে যাবার প্রস্তুতি বুঝলে। জিনিসপত্র সব বিক্রি টিক্রি করে হাত খালি করছি।

প্রস্তুতি কি একটু সকাল সকাল নিয়ে ফেলছো না ?

উহুঁ রিটায়ার করবার টাইম হয়ে আসছে। বছর দুই আছে মাত্র। নিশানাথ বাবু জার্মান সিলভারের ফুলদানি ছাড়াও একটা বড় আয়না কিনে ফেললেন। আয়নাটির দাম পড়লো তিন ডলার। স্ট্যানলি বারবার বললো, আয়নাটায় খুব জিতে গেলে। আমার স্ত্রী ইতালি থেকে ছ'শ লিরা দিয়ে কিনেছিল।

তিনি বাড়ি ফিরলেন এগারোটার দিকে। কী আশ্চর্য রুনকি বসে আছে বারান্দার ইজিচেয়ারে। রুনকি হাসি মুখে বললো, গ্যারাজ সেলে গিয়েছিলেন চাচা ?

হুঁ।

ইস কী যে এক রোগ বাঁধিয়েছেন।

ভেতরে আয় রুনকি।

আজ কী কিনলেন ?

জার্মান সিলভারের একটা ফুলদানি আর একটা আয়না। তুই নিবি ?

না।

আয়নাটা নিয়ে যা। ভাল জিনিস ছ'শ লিরা দাম পড়েছে ইটালিতে।

পড়ুক। চাচা আপনার কাছে বিদায় নিতে আসলাম।

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। চায়ের পানি চড়ালেন। রুনকি সোফায় বসতে বসতে বললো, আমরা মন্টানায় চলে যাচ্ছি।

মন্টানা খুব সুন্দর জায়গা।

আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না।

নিশানাথ বাবু বললেন, অল্প বয়সী মেয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে কথা বললে ভালো লাগে না। তাদের বলা উচিত আবার হয়তো দেখা হবে। অর্থ একই— আনসারটিনিটি। কিন্তু বলার ভঙ্গিটা অপটিমিস্টিক। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি ?

না চাচা। আপনাকে একটা খবর দেই আমরা বিয়ে করছি।

জানি। সফিক বলেছে। বাঙালি কায়দায় নাকি বিয়ে হবে ?

না সে রকম কিছু না।

নিশানাথ বাবু চা বানিয়ে এনে দেখেন রুনকি কাঁদছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, কাঁদছিস কেন মা ?

চাচা আমি কি ভুল করছি ?

কোনটা ভুল আর কোনটা না তা বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে। ও নিয়ে চিন্তা করিস না। চা খা।

রুনকি চায়ে চুমুক দিল। নিশানাথ বাবু গাঢ় স্বরে বললেন, খিদিরপুরের এক কলেজে অংক পড়াতাম বুঝলি রুনকি। কী নিদারুণ অভাব গেছে আমার। আর এখন পাশ বই দেখলে তুই চমকে উঠবি। আমি যদি খিদিরপুরে পড়ে থাকতাম সেটা ভুল হত। আবার আমেরিকা আসাটাও ভুল হয়েছে। তাহলে ঠিক কোনটা ?

রুনকি চুপ করে রইল। নিশানাথ বাবু বললেন, বেঁচে থাকার আনন্দটাই একমাত্র সত্যি। ঐটি থাকলেই হল। আয়নাটা একটা কাগজ দিয়ে বেঁধে দেই মা ?

দিন।

নিশানাথ বাবু আয়নাটি গিফট র‍্যাপ করবার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেলেন। রুনকি একটু হাসলো। সে জানে নিশানাথ বাবু শুধু আয়না কাগজ দিয়ে বাঁধবেন না। সেই সঙ্গে একটা খামের মধ্যে মোটা অংকের একটা চেক থাকবে। এটি নিশানাথ বাবুর একটি পুরনো অভ্যাস। রুনকির সব জন্মদিনে তিনি রুনকিকে গল্পের বই দেন। সেই বইয়ের ভেতর একটা খাম থাকবেই। যা দেয়ার তা সরাসরি দিয়ে দিলেই হয় কিন্তু তা তিনি দেবেন না। কত রকম অদ্ভুত মানুষ দুনিয়াতে আছে।

১৩

জোসেফাইনের মন ভেজানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বুড়ি পরিষ্কার বলে দিয়েছে।

কাজ তোমাকে দেব না। মাথা বেঠিক লোক আমি রাখি না। লুনাটিকদের বিষয়ে আমার এলার্জি আছে।

আমাকেতো তাহলে না খেয়ে থাকতে হয় জোসেফাইন। তুমি ছাড়া কে আমাকে কাজ দেবে ? উপোস দিতে হবে আমাকে।

একেবারে কিছুই না জুটলে এখানে এসে হামবার্গার খেয়ে যাবে চার্জ লাগবে না। কিন্তু চাকরি তোমাকে দিচ্ছি না।

ফার্গোতে বিদেশীদের কাজ পাওয়া ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এড দেখে টেলিফোন

করলেই জিজ্ঞেস করে— গ্রিন কার্ড আছে ? নেই শুনলেই খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। যারা কিছুটা ভদ্র তারা মিষ্টি সুরে বলে, এখানে ওপেনিং নেই। তুমি ঠিকানা রেখে যাও আমরা ওপেনিং হলে খবর দেব।

ওপেনিং নেইতো এড দিলে কেন ?

কয়েকটি ওপেনিং ছিল সেগুলি ফিল্ড আপ।

'দি মেঘনা রেস্টুরেন্টে'র জন্যে যে টাকা পয়সা উঠেছে (সর্বমোট সাতশ' এগারো ডলার) সেখানে হাত পড়েছে। রেস্টুরেন্টের চিন্তা এখন আর তেমন নেই। কারণ রহমান তার 'ইন্ডিয়া হাউস' নিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। তার ধারণা এত ছোট শহরে বিদেশী রেস্তোরাঁ চলবে না। সে খোঁজ নিয়ে দেখেছে এখানে যে ক'টি চীনা রেস্তোরাঁ আছে সেখানে শুক্র-শনি এই দু'দিনই যা লোকজন হয়। অন্যদিন রেস্তোরাঁ খা খা করে। তাছাড়া এই প্রচণ্ড শীতে কার এমন মাথা ব্যথা যে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে খেতে আসবে ?

এদিকে ইমিগ্রেশনের লোকজনও বেশ ঝামেলা করছে। তিন চারটা চিঠি এসেছে। কোনোদিন হুট করে হয়তো পুলিশ এসে হাজির হবে। ঠিকানা বদলাতে হলো সেই কারণেই। নিক্স প্লেসের উল্টোদিকে ছোট একটা ঘর। শুধু শোয়ার ব্যবস্থা। খাওয়া-দাওয়া নিক্স প্লেসে। বুড়ি তার কথা রেখেছে খাওয়ার পর বিল দিতে গেলে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করে, কাজ পেয়েছ ?

না।

নো চার্জ।

বেশ খাতায় লিখে রাখ চাকরি পেলে সব এক সঙ্গে দেব।

বাকির কারবার আমি করি না ভাগো।

কাজ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।

ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের সেই চাকরি।

গোটা দশেক বাঁদর, কয়েকটি কুকুর আর প্রায় শ'দুয়েক গিনিপিগের দেখাশোনা। সময়মত খাবার দাবার দেয়া। খাঁচা পরিষ্কার করা। পশুগুলিকে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত রাখা। কাজ অনেক সেই তুলনায় বেতন অল্প। নব্বই ডলার প্রতি সপ্তায়। নব্বই ডলারই সই। মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেল সফিক।

কাজটা যত খারাপ মনে হয়েছিল তত নয়। বাঁদরের খাঁচায় একটিকে পাওয়া গেল একেবারে শিশু। সফিককে দেখেই সে দাঁত বের করে ভেংচে দিল। সফিক অবাক, আরে তুই এইসব ফাজলামি কোত্থেকে শিখলি ?

বানরের বাচ্চাটি কথা শুনে উৎসাহিত হয়েই বোধহয় থু করে একদলা থুথু ছিটিয়ে দিল সফিকের দিকে।

মহা মুশিবত হলো তো শালাকে নিয়ে। মারব থাপ্পড়।

বাচ্চাটা গালি শুনে উৎসাহিত হয়ে খুব লাফালাফি শুরু করলো। তার আনন্দের সীমা নেই।

সন্ধ্যা সাতটা বাজে।

আনিস সবেমাত্র ফিরেছে ইউনিভার্সিটি থেকে। হাত মুখও ধোয়া হয় নি, সফিক এসে হাজির এক্ষুণি যেতে হবে তার সঙ্গে।

কী ব্যাপার আগে বল।

আগে বললে আপনি আর যাবেন না।

যাব। ঘরে তেমন কিছু নেই। এখন বল ব্যাপারটা কী ?

জং বাহাদুরের শয়তানিটা দেখাব আপনাকে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না শালা ওয়ান নাম্বার হারামি।

জং বাহাদুরটা কে ?

ও আপনাকে তো বলা হয় নাই। বাচ্চা একটা বাঁদর। বাচ্চা হলে কী হবে শয়তানের হাড্ডি। দেখবেন নিজের চোখে।

নিজের চোখে কিছু দেখা গেল না। জং বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছে। সফিক খুব মনমরা হয়ে পড়লো। আনিস হাসি মুখে বললো, কালকে এসে দেখব।

সকাল সকাল আসবেন। খাবার দেয়ার সময় হলে কী করে দেখবেন। বিকাল বেলা একটা কলা, একটা আপেল আর একটা ডিমসিদ্ধ দেয়া হয়েছে। শালা কলা আর ডিমটা খেয়ে আপেলটা আমাকে সাধছে দেখেন কাণ্ড।

তুমি না বললে শয়তানের হাড্ডি। আমার কাছে তো বেশ ভালো মানুষই মনে হচ্ছে।

আরে না না তার বজ্জাতির কথা তো কিছুই বললাম না।

আনিস হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বললো, তোমার কি কোনো কাজ আছে সফিক ? তোমার গাড়িতে আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে ?

কোথায় ?

আনিস খানিক ইতস্তত করে বললো, একটি মেয়ের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় হয়েছে। অনেকদিন তার খোঁজ নেই। ভাবছিলাম একটু খোঁজ নেব।

সফিক বেশ অবাক হলো। আনিস থেমে থেমে বললো, আমি দেশে ফিরে যাব সফিক। আমার ভালো লাগছে না। আমি ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

সে কোথায় থাকে ?

সাউথ ফার্গো।

চলুন যাই। ফুলের দোকান হয়ে যাবেন ? ফুল নেবেন ?

ফুল কেন ?

সফিক হাসি মুখে বললো, আমেরিকান মেয়েকে বিয়ের কথা কি ফুল ছাড়া বলা যায় ? এক গাদা গোলাপ নিয়ে যান। ডাউন টাউনে ফুলের দোকান সারারাত খোলা থাকে।

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ফুলতো কিনতেই হবে।

মালিশাকে পাওয়া গেল না। বাড়িওয়ালি সরু গলায় বললো, ওর মা মারা গেছে। ও গেছে টাকা পয়সা কিছু দিয়ে গেছে কিনা দেখতে।

কবে গিয়েছে ?

এক সপ্তাহ হলো।

আনিস বললো, ওকি টাকা পয়সা কিছু পেয়েছে?

আমি কী করে জানবো? একশো ডলার রেন্ট বাকি রেখে গেছে সে। আমি চিন্তায় অস্থির টাকাটা মার গেল কি না।

আমি কি এই গোলাপগুলি তার ঘরে রেখে যেতে পারি?

পারবে না কেন? রেখে যাও। তুমি কি ওর বন্ধু?

হ্যাঁ।

ভালো। আমার ধারণা ছিল ওর কোনো বন্ধু নেই। আমার দু'জন ভাড়াটে আছে যাদের কোনো ছেলে বন্ধু নেই একজন হচ্ছে মালিশা অন্যজন এমিলি জোহান।

এমিলি জোহান?

হ্যাঁ কবি এমিলি জোহান, নাম শুনেছ? খুব বড় কবি? রাইটার্স গিল্ড এওয়ার্ড পাওয়া।

আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

না পার না সে এখন মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে।

ফেরার পথে আনিস একটি কথাও বললো না।

১৪

সকাল বেলা একটা পার্কা গায়ে দিয়ে আমিন সাহেব শোভেল নিয়ে বেরুলেন। বরফে ড্রাইভওয়ে ঢাকা পড়েছে। পরিষ্কার না করলে গাড়ি বের করা যাবে না। অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে। চোখ জ্বালা করছে। কনকনে হাওয়া। নাক মুখ সমস্তই ঢাকা তবু সেই হাওয়া কী করে যেন শরীরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অল্পক্ষণ শোভেল চালাবার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বয়স হয়েছে। এখন আর আগের মত পরিশ্রম করতে পারেন না। দিন ফুরিয়ে আসছে। ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। চলে যাবার সময় হয়ে এলো। এবারের যাত্রা অনেক দূরে। গন্তব্যও জানা নেই। আমিন সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। রুনকি থাকলে এতটা পরিশ্রম হতো না। নিমিষের মধ্যে বরফ কেটে গাড়ি বের করে ফেলতো। তারপর ছুটাছুটি শুরু করত বরফের উপর। তুষার বল বানিয়ে চেঁচাতো— মারব তোমার গায়ে বাবা? দেখবে আমার হাতের টিপ? মেয়েটা একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেল।

না কথাটা ঠিক হলো না। রুনকি এখন আর ছেলেমানুষ নয়। আমিন সাহেব বিশ্রাম নেবার জন্যে গ্যারেজের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তখনই চোখে পড়লো রাহেলা দোতলার বারান্দায় একটা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডায় এমন পাতলা একটা চাদর গায়ে দিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে? নিউমোনিয়া বাঁধবে নাকি? রাহেলা উপর থেকে ডাকলেন,

চা খেয়ে যাও।

চা খেয়ে আমিন সাহেবের মনে হল তাঁর শরীর ভাল লাগছে না। নিঃশ্বাস নিতে একটু যেন কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। রাহেলা বললেন, আজকের এই দিনটি একটি

বিশেষ দিন। তোমার মনে আছে ?

না।

আজ রুনকির জন্মদিন।

আমিন সাহেব বড়ই অবাক হলেন। এতবড় একটা ব্যাপার তিনি ভুলেই বসে আছেন। উফ কী ঝামেলাই না হয়েছিল। বরফে চারদিক ঢাকা। বেশির ভাগ রাস্তাঘাটই বন্ধ। এর মধ্যে রাহেলার ব্যথা শুরু হল! অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলেই হতো তা না তিনি গাড়ি নিয়ে বের হলেন। ফিফটিনথ স্ট্রিট থেকে উঠিয়ে নিলেন নিশানাথ বাবুকে। কী দূরবস্থা ভদ্রলোকের। ব্যাপার ট্যাপার দেখে এই ঠাণ্ডাতেও তাঁর কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। রাহেলা একবার বললেন— আমার মনে হচ্ছে গাড়িতেই কিছু একটা হয়ে যাবে। নিশানাথ বাবু বললেন— মা কালীর নাম নেন, চেঁচামেচি করবেন না। রাহেলা ধমকে উঠলেন— মা কালীর নাম নেব কেন, মা কালী আমার কে ? এই সময় গাড়ি স্কিড করে খাদে পড়ে গেল। উহ্ কী ভয়াবহ সময়ই না গিয়েছে!

আমিন সাহেব বললেন, আমাকে আরেক কাপ চা দাও।

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ? তুমি ঘামছো।

না শরীর ঠিক আছে।

রাহেলা বললেন, আমি রুনকির জন্মদিন উপলক্ষে ছোট্ট একটা কেকের অর্ডার দিতে চাই।

আমিন সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। রাহেলা চোখ নিচু করে বললেন, আমি, তুমি আর নিশানাথ বাবু।

বেশতো।

রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, রুনকির প্রতি আমি অবিচার করেছি।

আমিন সাহেব জবাব দিলেন না। রাহেলা বললেন, নিজেদের মত ওকে আমরা বড় করেছি। ক্যাম্পিং এ যেতে দেই নি। ডেট করতে দেই নি।

বাদ দাও ওসব।

আমেরিকায় থাকব অথচ বাংলাদেশী সাজব সেটা হয় নাকি বল ?

আমিন সাহেব জবাব দিলেন না। রাহেলা বললেন, কাল রাত্রে আমি রুনকিকে স্বপ্নে দেখেছি। যেন ছোট খালার বাসায় ওকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছি। ছোট খালা বলছেন— রাহেলা তোর মেয়েতো পরিষ্কার বাংলা বলছে। আর তুই বললি ও বাংলা জানে না। ছোট খালাকে মনে আছে তোমার ?

না।

আমাদের বিয়েতে তোমাকে মুক্তা বসানো আংটি দিয়েছিলেন। সেই আংটি তোমার হাতে বড় হয়েছে শুনে ছোট খালা দুঃখে কেঁদে ফেলেছিলেন।

মনে পড়ছে। খুব মোটা-সোটা মহিলা তাই না ?

হ্যাঁ। কী যে ভালোবাসতেন আমাকে। এখন তাঁর শুনেছি খুব দুঃসময়! ছেলেদের সংসারে থাকেন। ছেলেরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করায় না। আমি

ছোট খালার নামে কিছু টাকা পাঠাতে চাই।
বেশতো।
ভাল এমাউন্টের টাকা। ছোট খালা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।
তা হবেন।
আমি পাঁচশ' ডলার পাঠাতে চাই।
আমিন সাহেব বললেন, আমি একটা ব্যাংক ড্রাফট করে আনব।
রাহেলার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো।
কাঁদছো কেন ?
কই কাঁদছি না তো।
রাহেলা মৃদু স্বরে বললো, তোমাকে একটা কথা বলিনি। গত মাসে রুনকি এসেছিল।
আমিন সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। রাহেলা বললো, রুনকির বাচ্চা হবে।
ও বলেছে তোমাকে ?
হ্যাঁ।
টম কি আছে এখনো তার সঙ্গে ?
আছে।
রুনকি কী জন্যে এসেছিল ?
ওর বাচ্চার জন্যে দুটি নাম চায়। একটি ছেলের নাম অন্যটি মেয়ের।
আমিন সাহেব দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, মেয়ে হলে ওর নাম রাখব বিপাশা।
বিপাশা ?
হ্যাঁ, পাঞ্জাবের একটা নদীর নাম। পাঞ্জাবে ওরা বলে বিয়াস।
তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে, তুমি খুব ঘামছো।
আমিন সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, আমার শরীরটা খারাপ লাগছে।
গাড়ি বের করার দরকার নেই। তুমি শুয়ে থাক। আর নিশানাথ বাবুকে টেলিফোন করে দাও সন্ধ্যাবেলা যেন আসেন আমাদের এখানে খাবেন।
আমিন সাহেব নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর শরীর বেশ খারাপ লাগছে। এই বয়সে বরফ না কাটাই ভাল। বড় বেশি চাপ পড়ে। শরীর দুর্বল হয়েছে এখন আর আগের মত চাপ সহ্য করতে পারেন না। পরীক্ষা করলে হয়ত দেখা যাবে ব্লাডে সুগার আছে।
নিশানাথ বাবুকে টেলিফোন করবার আগে কী মনে করে যেন দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিশানাথ বাবু ঘরেই ছিলেন।
নিশানাথ বাবু আমি আমিন।
বুঝতে পারছি। আপনার কি শরীর খারাপ ? এভাবে কথা বলছেন কেন ?
আমার শরীর ভাল না। আপনাকে একটি জরুরি ব্যাপারে টেলিফোন করছি।
বলুন।
আপনিতো জানেন আমার এই বাড়ি এবং টাকা পয়সা সব আমি আমার মেয়ের নামে

উইল করে রেখেছি। আপনি একজন উইটনেস।

আমি জানি।

নিশানাথ বাবু নানান কারণে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার মনের মিল হয় নি।

এই বয়সে সেটা তোলার কোনো যুক্তি নেই আমিন সাহেব।

আমিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেমে থেমে বললেন, আমি আমার স্ত্রীর উপর একটা বড় অন্যায় করেছি নিশানাথ বাবু। আজ আমি যদি মারা যাই সে পথের ভিখেরি হবে।

আমিন সাহেব আপনার শরীর কি বেশি খারাপ?

হ্যাঁ। আপনি কি একটু আসবেন আমি নতুন করে উইল করতে চাই।

আমি এক্ষুণি আসছি। সব কাগজপত্র নিয়ে আসব।

নিশানাথ বাবু।

বলুন।

আজ রুনকির জন্মদিন।

আমি জানি। সকালেই মনে হয়েছে।

আমিন সাহেব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে আনিস ছেলেটিকে কেমন মনে হয় আপনার?

খুব ভাল ছেলে। অত্যন্ত রিলায়েবল।

আমিন সাহেব টেলিফোন করলেন আনিসকে। আনিস বেশ অবাক হলো। আমিন সাহেব তাকে কখনো টেলিফোন করেন নি আগে।

আনিস তুমি আমকে চিনতে পারছ? আমি আমিন।

চিনতে পারছি। কী ব্যাপার বলুনতো?

আমার মেয়েটির দিকে তুমি লক্ষ রাখবে।

আনিস অবাক হয়ে বললো, আপনার কি শরীর খারাপ?

হ্যাঁ।

কী হয়েছে?

আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে সময় শেষ হয়ে আসছে। তুমি আমার মেয়েটির খোঁজ খবর রাখবে। প্লিজ!

আমি আসছি এক্ষুণি।

আমিন সাহেব দরজা খুলতেই দেখলেন রাহেলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাহেলার চোখে মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। রাহেলা বললেন, তোমার কী হয়েছে?

আমিন সাহেব বললেন, রাহেলা, আমি মারা যাচ্ছি।

রাহেলা আমিন সাহেবের হাত ধরে ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিলেন।

তোমার উপর খুব অবিচার করেছি রাহেলা।

রাহেলা দ্রুত আমিন সাহেবের সার্টের বোতাম খুলে ফেললেন। তাঁর হাত কাঁপছে। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আমিন সাহেব প্রচণ্ড ঘামছেন।

রাহেলা, তুমি রাগ করো না। একটা বড় অন্যায় করা হয়েছে।

রাহেলা দীর্ঘ দিন আগে মারা যাওয়া তাঁর মা'কে ডাক ছেড়ে ডাকতে লাগলেন— আম্মা ও আম্মা।

১৫

মালিশা গিলবার্ট তার মায়ের টাকা পেয়েছে। টাকার পরিমাণ মালিশার ধারণাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সলিসিটর যখন টেলিফোন করে বললো, তোমার জন্যে দুটি খবর আছে, একটি ভাল একটি মন্দ— কোনটি আগে শুনতে চাও?

তখনো মালিশা কিছু বুঝতে পারে নি। সে বলেছে ভালটি আগে শুনতে চাই।

তোমার হার্টের অবস্থা ভালতো? খবর শুনে ফেইন্ট হতে পার।

খবর শুনে তার অবশ্যি তেমন কোনো ভাবান্তর হয় নি। বাড়িওয়ালীকে গিয়ে বলেছে, আমার মা মারা গেছেন, আমি ফ্লোরিডা যাচ্ছি। তোমার রেন্ট আমি ফিরে এসে দেব।

প্লেনে যাওয়ার মত টাকা নেই, গ্রে হাউন্ডের টিকিট কাটতে হলো। পৌঁছতে লাগবে তেত্রিশ ঘন্টা। গ্রে হাউন্ডের বাস ছাড়বে রাত চারটায়। এমন লম্বা সময় কাটানোও এক সমস্যা। মালিশার বারবার মনে হচ্ছিল অ্যাটর্নি ভদ্রলোক হয়তো ভুল করেছে। মা হয়তো নাম কামাবার জন্যে টাকা পয়সা সব দিয়ে গেছে ক্যানসার ইনস্টিটিউটে কিংবা কোনো এতিমখানায়। সেইসব কাগজপত্র হয়তো অ্যাটর্নি ব্যাটা এখনো দেখে নি। না দেখেই টেলিফোন করেছে।

ফার্গো ফোরামেইতো একবার এ রকম একটি খবর উঠলো। কোটিপতি বাবা মারা গেছে। খবর পেয়ে ছেলেরা মহানন্দে বাড়ি-ঘর দখল করে বসেছে। কারখানায় গিয়ে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা শুরু করেছে এমন সময় অ্যাটর্নি অফিস থেকে চিঠি এসে হাজির— এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, জনাব সোরেনসেন জুনিয়র তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ইথিওপিয়ার ক্ষুধার্ত শিশুদের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে দান করিয়াছেন। অতএব...

মালিশার মা'র ব্যাপারেও সে রকম কিছু হয়েছে কিনা কে জানে। যদি সে রকম হয় তাহলে ফার্গো ফিরে আসার ভাড়াটাও থাকবে না! অবশ্যি ফিরে আসা এমন কিছু জরুরি নয়। তার জন্যে সব শহরই সমান।

বাসে বসতে গিয়ে মালিশা দেখলো তার সিট নাম্বার তের। এটি একটি অলক্ষণ। আগে জানলে টিকিট বদলে নিত। নিশ্চয়ই মা তার জন্যে কিছুই রেখে যায় নি। আর কেনই বা রাখবে একবারও কি মালিশা তার মায়ের কথা ভেবেছে? মৃত্যুর খবর পেয়ে তারতো সামান্য মন খারাপও হয় নি। ঈশ্বর এ জন্যে তাকে ঠিক শাস্তিই দেবেন। ফ্লোরিডা পৌঁছামাত্র অ্যাটর্নি বলবে, মিস আমাদের একটি বড় ভুল হয়ে গেছে। আপনার মা তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি আমেরিকান বন্য পশু সংস্থাকে দিয়ে গেছেন।

সে রকম কিছু হলো না।

ডরোথি গিলবার্টের হাতে লেখা উইল পাওয়া গেল। অ্যাটর্নি ভদ্রলোক মিষ্টি হেসে

বললো, মিস মালিশা তুমি নিশ্চয়ই এখনো আন্দাজ করতে পারছ না যে তুমি কত টাকার মালিক ?

মালিশা বললো, না আমি পারছি না।

সব হিসাব আমাদের হাতে আসে নি। তবে যা এসেছে তাতেই আমাদের মাথা ঘুরছে।

এ্যাটর্নিটির বয়স খুবই অল্প। সে মালিশাকে দুপুরে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গেল। হাসতে হাসতেই বললো, তুমি আবার মনে করে বসবে না যে তোমার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছি। আমি বিবাহিত। এবং স্ত্রীকে দারুণ ভালবাসি। একা একা যাতে তোমাকে লাঞ্চ খেতে না হয় সে জন্যেই আমি সঙ্গে এলাম।

তোমাকে ধন্যবাদ।

কী করবে তুমি এত টাকা দিয়ে ?

এখনো ভেবে ঠিক করিনি। তবে একজনকে আমি একটি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি উপহার দিতে চাই।

কী রঙ ?

নীল, আসমানি নীল।

কাকে দিতে চাও জানতে পারি ?

একজন ইন্ডিয়ানকে। তাঁর নামটি অদ্ভুত, অন্ধকারের দেবতা। সে আমার চোখের খুব প্রশংসা করেছিল।

সে ছাড়াও নিশ্চয়ই অনেকেই তোমার রূপের প্রশংসা করেছে। সবাইকেই কি তুমি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি দিতে চাও ?

কেউ সত্যিকারভাবে আমার রূপের প্রশংসা করে নি— ঐ ভদ্রলোক করেছিলো।

মিস মালিশা, এখন অনেকেই তোমার রূপের প্রশংসা করবে।

হ্যাঁ তা করবে।

মালিশার থাকবার জায়গা করা হয়েছে হিলটনে। কাগজপত্রের ঝামেলা মিটলেই স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা করা হবে। রাতে বিদায় নেবার আগে অল্প বয়সী অ্যাটর্নিটি হাসি মুখে বলেছে, তোমার টাকা পয়সার বিলি ব্যবস্থা করবার জন্যে একজন দক্ষ আইনজ্ঞ দরকার।

তুমি কি একজন দক্ষ আইনজ্ঞ ?

না। তবে বিশ্বাসী।

তুমি আমার হয়ে কাজ করলে আমি খুশিই হব।

ধন্যবাদ। প্রথমেই আমি তোমার জন্যে দু'জন সিকিউরিটি গার্ড রাখতে চাই। আমি কাল সকালেই ব্যবস্থা করব।

তার প্রয়োজন আছে কি ?

আছে। ধনী মহিলার জন্যে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। আমেরিকা বাস করবার জন্যে ভাল নয় মিস মালিশা।

সারারাত মালিশার ঘুম হলো না। অনেকবার মনে হলো সমস্ত ব্যাপারটাই একটা স্বপ্ন

নয়তো ? একটি নিখুঁত সুখের স্বপ্ন ? এক্ষুণি হয়তো ঘুম ভাঙবে। বাড়িওয়ালী এসে বলবে— এ মাসের হাউস রেন্ট একশ' ডলার এখনো দাও নি। আজকে কি তুমি একটি চেক লিখতে পারবে ? কিন্তু স্বপ্নটা আর ভাল লাগছে না। বড় খারাপ লাগছে। যেন সামনে দীর্ঘ একটা অন্ধকার পথ। হোটেল হিলটনের আরামদায়ক উষ্ণতায়ও মালিশার ভীষণ শীত করতে লাগলো। সে বেল টিপে বেয়ারাকে ঠাণ্ডা গলায় বললো, আমার ঘুম আসছে না। বড় খারাপ লাগছে।

১৬

মেমোরিয়াল লাউঞ্জে তুমুল উত্তেজনা।

অসহায় সামুদ্রিক তিমি মাছের কল্যাণে টাকা তোলা হচ্ছে। চারদিকে বড় বড় পোস্টার— 'তিমি মাছদের বাঁচার অধিকার আছে। নোংরা রাশিয়ান, তিমি শিকার বন্ধ কর।' পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কত তিমি মারা পড়ছে তার পরিসংখ্যানও ঝুলছে জায়গায় জায়গায়।

মেমোরিয়াল লাউঞ্জে দু'টি মেয়ে সেজেগুজে চুমু খাওয়ার স্টল (কিসিং বুথ) খুলে বসেছে। এদের চুমু খেলে দু'ডলার করে দিতে হবে। সেই ডলারটি চলে যাবে তিমি রক্ষার ফান্ডে। প্রচুর ডলার উঠছে। মেয়ে দু'টি চুমু খেয়ে কুল পাচ্ছে না। আনিস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়া দেখলো। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থেকেও কিছু কিছু জিনিসে এখনো সে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। কিসিং বুথ তার একটি।

হ্যালো আনিস।

আনিস তাকিয়ে দেখলো ডঃ বায়ার। হাতে সাবমেরিন স্যান্ডউইচ। গাল ভর্তি হাসি।

তিমি ফান্ডে কিছু দিয়েছ ?

এখনো না।

একটা এডভাইস দিচ্ছি ঐ নীল স্কার্ট পরা মেয়েটিকে চুমু খেতে যেও না। সে নিশ্চয়ই দাঁত ব্রাশ করে না। ডঃ বায়ার ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন।

আনিস তুমি কি লাঞ্চ খেতে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

আমি জয়েন করতে পারি তোমার সঙ্গে ?

তা পার।

আনিস তার প্রিয় জায়গাটিতেই গিয়ে বসলো। ভিড় নেই সবাই জড় হয়েছে তিমি মাছদের সাহায্যের ব্যাপার দেখতে। ডঃ বায়ার অনবরত কথা বলে যেতে লাগলো, আমেরিকানদের কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু ওদের না হলেও আবার কারোর চলে না।

আমেরিকানরা যদি এক বৎসর কোনো ফসল না করে তাহলে থার্ড ওয়ার্লডের চার ভাগের এক ভাগ লোক মরে ভূত হয়ে যাবে।

মুখে সবাই বলে আগলি আমেরিকান, কিন্তু হাত পাততে হয় আগলি আমেরিকানদের

কাছেই হা হা হা।

রাশিয়ানরা এ বৎসর কত লক্ষ মেট্রিক টন গম কিনছে জান ? জান না ? আন্দাজ করতো ?

আনিস হু হা করে যাচ্ছিল। ডঃ বায়ার তাতেই খুশি। একটির পর একটি প্রসঙ্গ টেনে আনতে লাগলো। এক সময় আনিস বললো, আমাকে এখন উঠতে হয়।

ক্লাশ আছে কোনো ?

না। লাইব্রেরিতে যাব।

পাঁচ মিনিট বস। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

আনিস তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ডঃ বায়ার বললেন, শুনলাম তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ। কেমিস্ট্রির চেয়ারম্যানের কাছে এই রকম একটা চিঠি দিয়েছ।

হ্যাঁ।

অবশ্যই এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু কারণ জানতে পারি কি ? তুমি একজন ভাল টিচার। এবং হাইলি কোয়ালিফাইড। খুব শিগগিরই ট্যেনিউর পাবে। তারপর গ্রিন কার্ডের জন্যে দরখাস্ত করতে পারবে।

ডঃ বায়ার এখানে আমার ভাল লাগছে না।

তোমাকে দোষ দেয়া যাচ্ছে না, এ জায়গার ওয়েদার অত্যন্ত খারাপ। তুমি বরং ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চলে যাও।

ওয়েদার নয়।

ডঃ বায়ার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, দেশটাই তোমার ভাল লাগছে না ?

না।

এখানে যে ফ্রিডম আছে সে ফ্রিডম তোমার নিজের দেশে আছে ?

না।

এখানকার মত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তোমার দেশে আছে ?

না তাও নেই।

দেখ আনিস আমি অনেক বিদেশীকে দেখেছি পড়াশুনা শেষ করে দেশে চলে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। চলেও যায় কিন্তু মাস ছয়েক পর আবার ছুটে আসে। স্বপ্ন-ভঙ্গ বলতে পার।

আনিস কিছু বললো না। ডঃ বায়ার কফিতে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, তোমরা বিদেশীরা থাক শামুকের মত। বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে পার না। এটা ঠিক না, আন্তর্জাতিক হতে চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীটাই হচ্ছে তোমার দেশ। এভাবে ভাবলে আর খারাপ লাগবে না।

আনিস কোনো উত্তর দিল না। ডঃ বায়ার হড়বড় করে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই কিসিং বুথের মেয়ে দুটিকে চুমু খাও নি। খেয়েছ ?

না।

এসো আমার সঙ্গে চুমু খাবে। আমাদের কালচারকে দূরে ঠেলে রাখলে তো চলবে না। এসোতো দেখি। তবে নীল স্কার্ট পড়া মেয়েটির থেকে দূরে থাকবে। আমি ঠিক করেছি ঐ মেয়েটিকে একটি জাম্বো সাইজের অ্যাকোয়া ফ্রশ টুথপেস্ট উপহার দেব হা হা হা।

আনিসকে ডঃ বায়ারের সঙ্গে দোতলায় উঠে আসতে হলো। কিসিং বুথের নীল স্কার্ট পরা মেয়েটি নেই। অন্য মেয়েটির গলায় উজ্জ্বল রঙের একটি রুমাল। শঙ্খের মত সাদা মুখ। শান্ত নীল চোখ। আনিসের মনে হল যেন মালিশা দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিন মালিশাকে দেখা হয় না। কিসিং বুথের মেয়েটি আনিসের দিকে তাকিয়ে হাসলো। হাসিটি পর্যন্ত মালিশার মত। ডঃ বায়ার বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন এগিয়ে যাও।

আনিস মন্ত্রমুগ্ধের মত এগুলো। কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারলো মেয়েটিকে। তার ছাত্রী। কোর্স নাম্বার পাঁচশ' দুই-তে আছে। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে রিনরিনে কণ্ঠে বললো, হ্যালো ডক।

আনিস ঠিক করে ফেললো এক গাদা ফুল নিয়ে আজ সন্ধ্যাতেই আবার যাবে মালিশার খোঁজে। কী ফুল নেয়া যায় ? ডাউন টাউনে ফুলের দোকান কটা পর্যন্ত খোলা থাকে ?

১৭

নিশানাথ বাবু সাত সকালে টেলিফোন করেছেন, হ্যালো সফিক এক কাণ্ড হয়েছে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি। কী হয়েছে ?

কে যেন একটা গাড়ি কিনে পাঠিয়েছে। নীল রঙের একটা বুইক।

. কে পাঠিয়েছে ?

কিছুই লেখা নাই।

পরিচিত যারা আছে তাঁদের জিজ্ঞেস করেছেন ?

পরিচিতরা আমাকে গাড়ি দেবে কেন ?

ভুলটুল হয় নাই তো ? অন্যের গাড়ি ভুলে হয়ত দিয়ে গেছে।

উ-হুঁ। আমার নাম লেখা আছে।

বলেন কী ?

তুমি একবার আসবে সফিক ? আমি মহা চিন্তায় পড়েছি।

এক ঘন্টার মধ্যে আসছি। জং বাহাদুরের কাণ্ড কারখানাও বলব।

নতুন কিছু করেছে নাকি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ না শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে না। শালা বজ্জাতের হাড্ডি।

তাই নাকি ?

গতকালকে ফস করে আমার পকেট থেকে নোট বইটা নিয়ে গেছে। আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই রকম ভাব করছে যেন সে নোট বইটা খেয়ে ফেলবে। বোঝেন অবস্থা! বাসায় থাকবেন আমি আসছি।

তুমি কি এক্ষুণি আসছ ?

একটু দেরি হবে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ওদের সকালের খাবার দিয়েই আসব। বাসায় থাকবেন আপনি।

ভোর ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ডঃ লুইস সফিককে বললেন— জং বাহাদুরকে নিয়ে ল্যাবরেটরি ওয়ানে যেতে। খাঁচা খুলতেই শান্ত ভঙ্গিতে জং বেরিয়ে এলো। গুটি শুটি হয়ে বসে রইলো সফিকের কোলে। ডঃ লুইস হেসে বললেন, এটি দেখছি খুব শান্ত স্বভাবের। খাঁচা থেকে বের করলেই এরা খুব চিৎকার করে। ওদের একটা সিক্সথ সেন্স আছে— বুঝতে পারে কিছু একটা হবে।

ডঃ লুইস জং বাহাদুরের গায়ে দু'টি ইনজেকশন করলেন এবং সফিককে বললেন, একে এখন চব্বিশ ঘন্টা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। তিন নম্বর খাঁচায় রেখে দাও।

সফিক দেখলো জং বাহাদুর ঝিম মেরে গেছে, নড়াচড়া করছে না। খাঁচায় নামিয়ে রাখতেই সে শান্ত ভঙ্গিতে মাঝখানে গিয়ে বসে রইলো। সফিক বললো, এই ব্যাটা কী হয়েছে তোর ?

জং বাহাদুর দাঁত বের করলো না। জিভ বের করে ভেংচে দিল না। শুধু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলো।

ডঃ লুইস কী দিয়েছেন ওকে ?

হেভি মেটাল পয়জনিং করা হয়েছে। রক্তের মধ্যে মারকারির একটা সল্ট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ও মারা যাবে ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে। আমরা মেটাল পয়জনিং-এর ইফেক্ট লক্ষ করব। ব্লাড প্রেসার কী করে ফল করে সেটা মনিটর করা হবে।

সফিকের গা কাঁপতে লাগলো। তিন নম্বর খাঁচার সামনে গিয়ে ভাঙা গলায় ডাকলো, জং বাহাদুর, জং বাহাদুর।

জং বাহাদুর ঘাড় ঘুরিয়ে থাকলো। কী শান্ত দৃষ্টি!

দু'নম্বর খাঁচার সব ক'টি বানর ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জং বাহাদুরের দিকে। ওরা কি কিছু বুঝতে পারছে ? ডঃ লুইস এসে দেখলেন পিপুল ডাইলেটেড হতে শুরু করেছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। লোহিত রক্ত কণিকা ফুসফুস থেকে আর রক্ত নিয়ে যেতে পারছে না।

সফিক ক্লান্ত স্বরে বললো, ডঃ লুইস বড্ড খারাপ লাগছে আমার।

সফিকের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো। জং বাহাদুর তাকাচ্ছে সফিকের দিকে। সফিক মৃদু স্বরে বললো, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যোয়ালেমিন।

ডঃ লুইস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সেন্টিমেন্টাল ইন্ডিয়ানস। সিলি সেন্টিমেন্টের জন্যেই ওদের কিছু হয় না। চাইনিজ পোস্ট ডকটিও চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সফিকের দিকে। সে অস্পষ্ট স্বরে চাইনিজ ভাষায় কী যেন বললো— নিশ্চয়ই কোনো ইস্টার্ন ফিলোসফি। রাবিশ, এসব সেন্টিমেন্টাল ইন্ডিয়ানদের নিয়ে মুশকিল। এরা বড় ঝামেলা করে।

সফিক জং বাহাদুরের খাঁচার শিক দু'হাতে ধরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। জং বাহাদুর মনে হল এগিয়ে আসছে তার দিকে। সফিক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো।

১৮

মিস মালিশা আপনার কি রাতে ঘুম হয় নি ?

নাহ্।

স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছিল সে জন্যে এই হয়েছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে কোনো একটা সিডেটিভের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। ভুলটা আমার।

মালিশা চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো অ্যাটর্নির দিকে। অল্প বয়সী এই ছোঁড়াটাকে বেশ লাগছে তার। সে বললো, আমি তোমার নাম ভুলে গেছি। আই অ্যাম সরি।

আমার নাম ডেনিস বেয়ার। তুমি আমাকে বিল ডাকতে পার।

বিল একটি বুইক গাড়ি পাঠাবার কথা বলেছিলাম।

পাঠানো হয়েছে।

কে পাঠিয়েছে কী কিছুই লেখা নেই তো ?

না। কিন্তু মিস মালিশা কাউকে গিফট দেয়ার প্রধান আনন্দইতো হচ্ছে গিফট পেয়ে সে কেমন খুশি হল তা জানা, ঠিক নয় কি ?

মালিশা জবাব দিল না। ডেনিস বেয়ার মিটমিট করে হাসতে লাগলো। মালিশা বললো, হাসছো কেন ?

আজকের ন্যাশনাল ইনকোয়ারারে তোমার ছবি ছাপা হয়েছে। তুমি বিখ্যাত হতে শুরু করেছ।

মালিশা ক্লান্ত স্বরে বললো, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। আজ আমি কোথাও যেতে চাই না।

মিস মালিশা ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে আজকে একবার যেতেই হবে। ঘন্টা খানিকের বেশি লাগবে না। অনেস্ট।

মালিশা জবাব দিল না। ডেনিস বেয়ার একটি সিগারেট ধরিয়ে হাসি মুখে বললো, সেখান থেকে যাব চেস ম্যানহাটনে, কথা দিচ্ছি ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব।

আজকে না গেলে হয় না ?

না। আজকে যেতে হবে। ডলার একটি চমৎকার জিনিস। পৃথিবীর মধুরতম শব্দকটির একটি। কিন্তু শব্দটি মধুময় করে রাখার যন্ত্রণাও কম নয়।

প্রকাণ্ড একটি ফোরডোর শেভ্রোলেট গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির পেছনের সিটে মধ্য বয়সী একজন ভদ্রলোক একটি সামার কোট পরে বসে আছেন। ডেনিস বেয়ার মৃদু স্বরে বললো, ওর নাম জিম। তুমি যখনি বাইরে যাবে ও ছায়ার মত থাকবে তোমার সঙ্গে। ও তোমার বডিগার্ড। খুব এফিসিয়েন্ট লোক।

মালিশা ক্লান্ত স্বরে বললো, আমার এসব দরকার ছিল না।

দরকার আছে।

গাড়িতে উঠেই মালিশা বললো, আমার কেন যেন ভাল লাগছে না, কিছুতেই মন বসছে না।

সন্ধ্যাবেলা অপেরা দেখতে চাও।

টিকিট পাওয়া যাবে?

ডলার দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জিনিস পাওয়া যায়।

তাই কি?

হ্যাঁ। তুমি কী চাও আমাকে বলবে আমি ব্যবস্থা করব। ডলারের মত চমৎকার জিনিস কি পৃথিবীতে আছে?

ডলারের মত চমৎকার জিনিস পৃথিবীতে নেই, না?

না।

মালিশার মনে হল তার জ্বর আসছে। কিছুই ভাল লাগছে না। গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁসে জিম বসে আছে। লোকটি মূর্তির মত, সমস্ত রাস্তায় একবার শুধু বললো, চমৎকার ওয়েদার মিস মালিশা।

ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে দু'ঘণ্টার মত লাগলো। মালিশাকে তেমন কিছু করতে হল না। শুধু চুপচাপ বসে থাকা। মাঝে মাঝে দু'একটা ফর্মে সই করা। অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে মিনিট দশেকের কথাবার্তা বলতে হল। দু'ঘণ্টা বসেই মালিশার প্রচণ্ড মাথা ধরে গেল।

চেস ম্যানহাটনে যাবার পথে ডেনিস বেয়ার শান্ত স্বরে বললো, মিস মালিশা আমি বুঝতে পারছি আপনার খুব বিরক্তি লাগছে। কিন্তু উপায় নেই।

চেস ম্যানহাটনে আজ না গেলে হয় না?

না। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

মালিশা চুপ করে গেল। জিম বললো, চমৎকার ওয়েদার তাই না মিস্টার বেয়ার? ডেনিস বেয়ার সে কথার জবাব না দিয়ে মালিশার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললো, আমার মনে হয়, আইবিএম-এ তোমার যে শেয়ার আছে সেগুলি বিক্রি করে ফেলা উচিত। আইবিএম ফল করতে শুরু করেছে। তুমি কি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পড়?

না।

এখন থেকে নিয়মিত পড়বে। আমি একজন অ্যানালিস্টও ঠিক করে রেখেছি। সে সপ্তাহে একদিন এসে তোমাকে ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাপারগুলি এক্সপ্লেইন করবে।

মালিশা শুকনো গলায় বললো, গাড়িটা একটু রাখতে বল, আমার বমি আসছে।

গাড়ি থামাবার আগেই মুখ ভর্তি করে বমি করলো মালিশা।

আই অ্যাম সরি।

সরি হবার কিছুই নেই।

এখন কি ভালো লাগছে?

নাহ্ বড্ড খারাপ লাগছে। প্লিজ আমাকে হোটেলে নিয়ে চল।

১৯

ইন্টারস্টেটে আসা মাত্র হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ গাড়ি থামালো। ফার্গো মুরহেড এলাকায় তুষার ঝড় হবার সম্ভাবনা— প্রচুর বরফ পড়ছে। হাইওয়ে ক্লোজ করে দেয়া হয়েছে। টম নেমে এলো গাড়ি থেকে।

অফিসার, আমাকে যেতেই হবে। এই মেয়েটির বাবা মারা যাচ্ছে। এই সময় মেয়েটির তার বাবার কাছে থাকা দরকার।

রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। অনেক গাড়ি স্কিড করে পথের পাশে পড়ে আছে।

আমি খুব কেয়ারফুল ড্রাইভার। বিশ মাইলের উপর স্পিড তুলবো না, প্লিজ অফিসার প্লিজ!

তুমি বুঝতে পারছ না দারুণ রিস্কি ব্যাপার।

অফিসার প্লিজ! এই মেয়েটিকে আমি যে করেই হোক তার বাবার কাছে নিয়ে যেতে চাই।

গাড়ি চলছে খুব ধীর গতিতে। টম সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে আছে। সে এক সময় শান্ত স্বরে বললো, ভাল মত কম্বল জড়িয়ে নাও রুন। হিটিং কাজ করছে না।

রুনকি পায়ের উপর কম্বল টেনে দিল। কোনো কথা বললো না। টম নিচু ভল্যুমে একটি ক্যাসেট চালু করেছে। রাতের বেলা গাড়ি চালাতে হলে ঘুম তাড়াবার জন্যে এটা করতে হয়। মিষ্টি সুরে পোলকা বাজছে। রুনকি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠ। বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে সব। কী ভয়ংকর সুন্দর!

২০

আনিস এসেছে একা একা।

তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তা জনমানব-শূন্য। থার্মোমিটারের পারা নিচে নামতে শুরু করেছে। স্ট্রিট লাইটের আলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কে জানে তুষার ঝড় হবে কি না। উত্তর দিক থেকে বাতাস দিচ্ছে। লক্ষণ মোটেই ভাল নয়। আনিস এমিলি জোহানের ঘরের কড়া নাড়লো।

এমিলি জোহান তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো ? মেমোরিয়াল ইউনিয়নে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো।

হ্যাঁ চিনতে পারছি। খুব কম মানুষের সঙ্গে আজকাল আমার দেখা হয়। আমি সবাইকে মনে রাখি।

আমি একটা মেয়ের খোঁজ করছিলাম মালিশা গিলবার্ট। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

এমিলি জোহান শান্ত স্বরে বললো, তুমি কি ওর জন্যে গোলাপ ফুল এনেছিলে। ল্যান্ড লেডি আমাকে বলেছিল।

আনিস জবাব দিল না। এমিলি জোহান থেমে থেমে বললেন, আমরা আমেরিকানরা খুব অদ্ভুত জাত। যখন কোনো কিছু চাই মন প্রাণ দিয়ে চাই। যখন সেই জিনিসটি পাওয়া যায় তখন জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।

আনিস কিছু বুঝতে পারলো না। এমিলি জোহান থেমে থেমে বললেন, মালিশা গিলবার্ট ঘুমের অসুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে। দীর্ঘ বিরতিহীন ঘুম। আনিস, তুমি কি আমার ঘরে এসে বসবে ? নক্ষত্র নিয়ে আমি একটি চমৎকার কবিতা লিখেছি।

আনিস বেরিয়ে আসলো। বরফে বরফে চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে। একটি পরাজিত শহর।

তুষার ঝড় হবে। নিশ্চয়ই তুষার ঝড় হবে।

আনিস পায়ে হেঁটে বাড়ির পথ ধরলো। ভুতে পাওয়া শহরের জনশূন্য পথ ঘাট। কী অদ্ভুত লাগে হাঁটতে। ব্রডওয়ের কাছে ছাতা মাথায় একটি রোগা মেয়েকে দেখা গেল। সিগারেটের আলোয় তার ক্লান্ত মুখ চোখে ভাসলো ক্ষণিকের জন্যে। মেয়েটি ক্ষীণস্বরে বললো, হ্যালো মিস্টার, কী নেস্টি ওয়েদার।

আনিস জবাব দিল না। মেয়েটি থেমে থেমে বললো, আজ রাতের জন্যে তোমার কোনো ডেট লাগবে ?

নাহ্ ধন্যবাদ।

মেয়েটি এগিয়ে এলো তবু। মুখের সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে সরু গলায় বললো, তুমি কি আমার জন্যে এক মগ বিয়ার কিনবে ? কী দুঃসহ শীত।

একদিন এই দুঃসহ শীত শেষ হবে। আসবে রোদ উজ্জ্বল সামার। ছুটি কাটানোর জন্যে আমেরিকানরা গাড়ি নিয়ে নেমে আসবে হাইওয়েতে। মন্টানা, সল্ট লেক, ইয়েলো স্টোন পার্ক। কত কিছু আছে দেখবার। সামারের রাতগুলি এরা বনের ধারে তাঁবু খাটিয়ে কাটাবে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না হবে রাতে। যুবক যুবতীদের বড্ড বনে যেতে ইচ্ছা করবে।

সবাই গেছে বনের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। পাত্র-পাত্রীদের কাউকেই আমি কোনোদিন দেখি নি।